প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক — অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

Subject: Honours in Sociology (ESO)

Bachelor Degree Programme (BDP)

Paper - II (Social Institutions and Processes)

Module-1 : Social Institutions and Processes : Meaning and Types

প্রথম মুদ্রণ ঃ এপ্রিল, 2022

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the
Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতক পাঠক্রম

সমাজতাত্ত্বিক চিন্তা

Subject: Honours in Sociology (ESO)

Bachelor Degree Programme (BDP)

Paper - II (Social Institutions and Processes)

Module-1 : Social Institutions and Processes : Meaning and Types

: Board of Studies :
Members

Professor Chandan Basu
Director, School of Social Sciences,
Netaji Subhas Open University (NSOU)

Professor Bholanath Bandyopadhyay
Retired Professor, Deptt. of Sociology,
University of Calcutta

Professor Sudeshna Basu Mukherjee
Deptt. of Sociology,
University of Calcutta

Kumkum Sarkar
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Professor Prashanta Ray
Emeritus Professor, Deptt. of Sociology,
Presidency University

Professor S.A.H. Moinuddin
Deptt. of Sociology,
Vidyasagar University

Ajit Kumar Mondal
Associate Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Anupam Roy
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

: Course Writer :

Dr. Sudeshna Paul
Assistant Professor in Sociology
Kalyani Mahavidyalaya

: Course Editor :

Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor in Sociology
NSOU

: Format Editor :
Dr. Srabanti Choudhuri
Assistant Professor, Deptt. of Sociology,
NSOU

Notification

All rights reserved. No part of this Study material be reproduced in any form without permission in writing from Netaji Subhas Open University.

Kishore Sengupta
Registrar

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

Subject: Honours in Sociology (ESO)
Bachelor Degree Programme (BDP)
Course : Paper - II (Introducing Sociology)
Module-1 : Social Institution and Processes : Meaning and Types

প্রথম একক (Unit – I) ❑ সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregates) 11-20

দ্বিতীয় একক (Unit – II) ❐ সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Institution) 21-47

তৃতীয় একক (Unit – III) ❐ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process) 48-58

চতুর্থ একক (Unit – IV) ❐ বিয়োজক সামাজিক প্রক্রিয়া (Dissociative Social Process) 59-72

Paper - II

Module – 1

SOCIAL INSTITUTIONS AND PROCESSES : MEANING AND TYPES

দ্বিতীয় পত্র

প্রথম অধ্যায়

সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রক্রিয়া ঃ অর্থ এবং রূপভেদ

পর্যায় 1 ◻ সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রক্রিয়া : অর্থ এবং রূপভেদ

উদ্দেশ্য ও ভূমিকা

একক 1 সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregates)

একক 2 সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Second Instituation)

একক 3 সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process) এবং সংযোজক সামাজিক প্রক্রিয়া (Assciative Second Process)

একক 4 বিয়োজক সামাজিক প্রক্রিয়া (Dissociative Second Process)

উপসংহার

অনুশীলনী

গ্রন্থপঞ্জী

উদ্দেশ্য (Purpose of the Module)

সমাজতত্ত্ব হল এমন এক বিজ্ঞান যা মানুষের সামাজিক সম্পর্কগুলিকে নির্দিষ্ট শৃঙ্খলাবদ্ধ যুক্তিযুক্ত এবং প্রমাণভিত্তিক উপায়ে পঠন-পাঠন ও অনুশীলন পূর্বক অধ্যয়ন করে থাকে। অন্যান্য সমস্ত বিজ্ঞানগুলির ন্যায় সমাজতত্ত্বেও বিশেষ কিছু ধারণা এবং পরিভাষা ব্যবহার করা হয় এবং সেগুলিকে নির্দিষ্ট রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ সমস্যা হল, যেহেতু মানুষ মাত্রই সমাজে বসবাস করেন এবং প্রতিনিয়ত সমাজ জীবনে ঐ ধারণাগুলিকে নিজেদের মত ব্যবহার করেন ফলে উক্ত ধারণাগুলি সাধারণভাবে তাদের নিজস্ব বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা থেকে বিচ্ছিন্ন রূপে এবং বিবিধ ভাবে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে থাকে। ফলে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক ভিত্তিমূলক / মৌল ধারণা, যেমন— সমাজ, জনসম্প্রদায়, সমিতি, প্রতিষ্ঠান, সম্পর্ক, বিবাহ, রাষ্ট্র, সম্পত্তি প্রভৃতি সমাজে বহুল ব্যবহৃত হলেও তাদের ব্যবহার এত ব্যাপক ও বিবিধ যে তা বৈজ্ঞানিক পঠন পাঠনে গভীর সংশয় সৃষ্টি করে। বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য হল, সমাজতত্ত্বেবর ছাত্রছাত্রীদের সমাজতত্ত্বের এই ভিত্তিমূলক ধারণা, পরিভাষা এবং তাদের সমাজতাত্ত্বিক বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও রূপভেদ সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান দান করে তাদের বৌদ্ধিক জগতে সমাজতত্ত্ব অধ্যয়ন ও চর্চার জন্য প্রয়োজনীয় ভিত্তি রচনা করা।

ভূমিকা (Introduction)

সমাজতত্ত্বের মূল বিষয় হল সামগ্রিক ভাবে মানব সমাজ এবং বহুবিধ সামাজিক সম্পর্কের আলোচনা,

অধ্যায়ন ও চর্চা। অধ্যাপক বটোমোরের মতে, যা কিছু সামাজিক, বিশেষতঃ মানবিক, তা এর আলোচনাক্ষেত্রের অন্তর্গত। সমাজ জীবন মানেই একাধিক মানুষের মধ্যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া তথা মিথস্ক্রিয়া জাত সম্পর্কের মাধ্যমে গড়ে ওঠা সম্পর্ক-জালিকায় ব্যক্তির এবং অন্যান্য বহু ব্যক্তির অবস্থান, আচরণ এবং কার্যাবলী। এই সম্পর্ক-জালিকাই গোষ্ঠী জীবনের সৃষ্টি করে। মানব সমাজে বহু ও বিবিধ গোষ্ঠী বর্তমান। সকল মানুষ সকল গোষ্ঠীর সদস্য হতে পারে না বা হয় না। গোষ্ঠী সদস্যপদ অনেক সময় মানুষের ইচ্ছাধীন, আবার কখনো বা তা জন্মসূত্রে নির্ধারিত। বর্তমান অধ্যায়ের প্রথম এককে মানব সমাজের প্রধান গোষ্ঠীসমূহ, তাদের বৈশিষ্ট্য, গুরুত্ব এবং প্রকারভেদগুলি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। আবার গোষ্ঠীজীবন যাপনের জন্য প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্যদের কিছু লিখিত বা অলিখিত নিয়মাবলী পালন করতে হয়। এই সমস্ত নির্দিষ্ট আচরণ-বিধি এবং নিয়মাবলী যা গোষ্ঠীজীবনকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে সেগুলিকে বলে প্রতিষ্ঠান। সমগ্র সমাজজীবন বাস্তবে বিবিধ প্রতিষ্ঠানের পরস্পর সংযুক্তি এবং পরস্পর নির্ভরশীলতার প্রকাশ। বর্তমান অধ্যায়ের দ্বিতীয় এককে সমাজের প্রধান কয়েকটি প্রতিষ্ঠান, তাদের বৈশিষ্ট্য, কার্যাবলী, রূপভেদ এবং গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক বাচনিক বা অবাচনিক বা মিশ্র ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যাকে সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় মিথস্ক্রিয়া (Interaction) বলা হয়, তা জন্ম দেয় বিবিধ সামাজিক সম্পর্কের। সুতরাং সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার অধ্যয়ন সমাজতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর দু'টি কারণ আছে :

প্রথমতঃ, দৈনন্দিন সমাজ জীবনে প্রতিনিয়ত এই মিথস্ক্রিয়া ঘটে চলেছে এবং এগুলিই সমাজস্থ মানুষের বিবিধ আচরণ ও কার্যের নির্দিষ্ট কাঠামো ও আকার সমূহের নির্মান করে। সুতরাং বিবিধ সামাজিক সম্পর্ক ও সমাজজীবন সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানলাভ এবং চর্চার জন্য এই মিথস্ক্রিয়াগুলির পাঠ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিতীয়তঃ, সামাজিক মিথস্ক্রিয়াগুলির অধ্যয়ন দ্বারা আমরা বৃহত্তর সামাজিক ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান সম্পর্কে জানতে পারি। বস্তুত সমস্ত বৃহৎ সমাজব্যবস্থা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনুষ্ঠিত সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ধারার উপর নির্ভর করে। মিথস্ক্রিয়াসমূহের নির্দিষ্ট ধাপভিত্তিক ক্রমানুসারি সময়ানুগ এবং ধারাবাহিক পুনরাবৃত্তির ফলে সৃষ্টি হয় বিবিধ সামাজিক প্রক্রিয়া যা কখনো সমাজস্থ ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে সংযোগ এবং ঐক্য বর্ধন করে, আবার কখনো বা পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধি করে। এই অধ্যায়ের তৃতীয় এবং চতুর্থ এককে সামাজিক প্রক্রিয়াসমূহ, তাদের বৈশিষ্ঠ্য, গুরুত্ব এবং প্রকারভেদ সম্পর্কে বিশদে আলোচনা করা হয়েছে। পরিশেষে, আলোচনা করা হয়েছে এইসব বিবিধ গোষ্ঠী, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি এবং তাদের মধ্যে অবিরহ ঘটে চলা সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি কি ভাবে স্থান-কাল-পাত্র অতিক্রম করে মানুষের সামাজিক জীবন এবং আচরণকে সমন্বিত করে।

প্রথম একক (Unit – I) ❑ সামাজিক সমষ্টি (Social Aggregates)

সাধারণভাবে, সামাজিক সমষ্টি বলতে আমরা বুঝি, একই সময়ে একই স্থানে অবস্থানকারী একাধিক ব্যক্তিবর্গকে, যাঁদের মধ্যে কোন প্রত্যক্ষ পারস্পরিক সংযোগ লক্ষিত হয় না। অথচ গোষ্ঠী সচলতার প্রেক্ষীতে তাঁরা যে কেউ একত্রিত ভাবে একই গোষ্ঠীর ন্যায় আচরণ করেন। (লিঙ্ক ২০০৯ : ১)

সমাজতাত্ত্বিক নিসবেটের (১৯৭০ : ৮১) মতে, সামাজিক সমষ্টি হল, একাধিক মানুষের বাস্তবিক অথবা ধারণাগত সমষ্টি, যেখানে প্রত্যেকে অপরের অবস্থান এবং তাঁদের দ্বারা গঠিত সমষ্টির অবস্থান সম্পর্কে অবগত। একই সামাজিক সমষ্টির অন্তর্গত প্রতিটি ব্যক্তি তাঁদের বাহ্যিক আচরণে একটি নির্দিষ্ট সামাজিক নিয়ম-নীতি মেনে চলেন, যা তাঁদের পারস্পরিক সংহতির পরিচায়ক (ডহরেনওয়েড ১৯৫৯ : ৪৭০)।

'সামাজিক সমষ্টি' ধারণাটির পরিধি ব্যাপক। এই ধারণার অন্তর্গত কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সমাজতাত্ত্বিক ধারণা হল ঃ জন সম্প্রদায় (Community), সমিতি (Association) এবং প্রতিষ্ঠান (Institution)।

জনসম্প্রদায় (Community) ঃ

ব্যবহারিক জীবনে 'জনসম্প্রদায়' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে প্রচলিত। সাধারণভাবে বর্ণভিত্তিক, ধর্মভিত্তিক, জাত-ভিত্তিক, ভাষা-ভিত্তিক, এমনকী পেশা-ভিত্তিক জনগোষ্ঠীকেও জনসম্প্রদায় রূপে চিহ্নিত করার চল আছে। কখনো বা ব্যাপক অর্থে সমগ্র মানবজাতিকে উদ্দেশ্য করেও 'সম্প্রদায়' শব্দটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু সমাজতত্ত্বে 'জনসম্প্রদায়' একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা এবং তাকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। সমাজতাত্ত্বিক বোগারডাস তাঁর ***ডেভেলপমেন্ট অফ সোস্যাল থট*** নামক গ্রন্থে বলেছেন, জনসম্প্রদায় হল কিছু মাত্রার 'আমরা-বোধ' সম্বলিত একটি সামাজিক গোষ্ঠী এবং এরা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করে। আর. এম. ম্যাক আইভারের মতে, জনসম্প্রদায় হল সামাজিক জীবন নির্বাহের এমন একটি ক্ষেত্র যা বিশেষ ধরণের সামাজিক ঐক্যমত্য দ্বারা চিহ্নিত।

অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস এর মতে, জনসম্প্রদায় হল ক্ষুদ্রতম আঞ্চলিক জনগোষ্ঠী যা সমাজ জীবনের সমস্ত প্রেক্ষিতগুলিকে বেষ্টন করে থাকে। সুতরাং 'জনসম্প্রদায়' ধারণাটির মূল ভিত্তি দু'টি— **(১) আঞ্চলিকতা, (২) জনসম্প্রদায়গত আমরা-বোধ**।

(১) আঞ্চলিকতা ঃ জনসম্প্রদায় এক প্রকার অঞ্চলভিত্তিক জনসমষ্টি। একটি জনসম্প্রদায় একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস করে। ভৌগোলিক আঞ্চলিকতা হল জনসম্প্রদায়ের অন্যতম প্রধান ভিত্তি।

একই ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস-এর ফলে জনসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ নিবিড় হয়, পারস্পরিক নিরাপত্তা এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত হয়। নির্দিষ্ট অঞ্চলে গোষ্ঠীবদ্ধ বসবাস সদস্যদের মধ্যে গোষ্ঠীর সাধারণ স্বার্থ সমূহ সম্পর্কে আগ্রহ সঞ্চারে এবং একত্রে সেই স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে অগ্রসর হতে সহায়তা করে। এছাড়া ভৌগোলিক অঞ্চলগত প্রাকৃতিক পরিবেশ জনসম্প্রদায়ের সামাজিক

জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। উর্বর মৃত্তিকা, খনিজ সম্পদ, অরণ্যানি, বনজ সম্পদ, জল সম্পদ, জলবায়ু প্রভৃতি অঞ্চলগত বৈশিষ্ট্য একটি জনসম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অর্থনৈতিক জীবনকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। সুতরাং, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে বসবাস একটি জনসম্প্রদায়ের মানুষের জীবনযাত্রাকে প্রায় সমসত্ত্ব প্রকৃতি দান করে। যা তাদের সামাজিক সংহতির অন্যতম ভিত্তিস্বরূপ।

(২) জনসম্প্রদায়গত আমরা-বোধ ঃ জনসম্প্রদায়গত আমরা-বোধ বা আবেগ বলতে বোঝায় 'আমরা সকলে এক'-এ ধরণের এক বোধ বা অনুভূতি। জনসম্প্রদায়ের সকল সদস্য তাদের গোষ্ঠীগত সহাবস্থান, একই রকম জীবনযাত্রা, জীবনবোধ এবং সাধারণ গোষ্ঠী স্বার্থে সম্পর্কে সম্যকভাবে সচেতন। এই সচেতনাতা থেকে তৈরী হয় গোষ্ঠীর সঙ্গে বিশেষ একাত্মতা। গোষ্ঠীজীবন সম্পর্কে এই একাত্মতা, সচেতনতা, গোষ্ঠীজীবনের সমসত্ত্বতা এবং গোষ্ঠী স্বার্থ সম্পর্কে সচেতনতা ও ঐক্যানুভূতি ছাড়া জন সম্প্রদায় গঠন সম্ভব নয়।

অন্যান্য বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) জনসম্প্রদায় একটি স্থায়ী জনসমষ্টি।

(২) জনসম্প্রদায় অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে গঠিত জনসমষ্টি। এর নির্মাণে কোন প্রকার সুচারু পরিকল্পনার প্রয়োজন হয় না। জন্মসূত্রে ব্যক্তি কোন জনসম্প্রদায়ের সদস্যপদ লাভ করেন। সুতরাং জনসম্প্রদায়ের সদস্যপদ ব্যক্তির ইচ্ছা-ভিত্তিক হয় না। জনসম্প্রদায়ের জন্ম এবং বিস্তার স্বতঃস্ফূর্ত, কোনরূপ পরিকল্পনা প্রসূত অথবা আকস্মিকতা প্রসূত নয়।

(৩) সময়ের বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি জনসম্প্রদায় তার নিজস্ব ঐতিহ্য, প্রথা, নীতিবোধ, আচরণবিধি সম্বলিত একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলে এবং বিশেষ নিয়ম-কানুন দ্বারা জনসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণ করে। এই ঐতিহ্য-অভিজ্ঞতা-প্রথা-প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে যে আমরা-বোধ সেটাই সমষ্টিগত জীবন ধারণের প্রয়োজনীয়তাকে আকার দেয় এবং জনসম্প্রদায়গত ঐক্য সুদৃঢ় করে।

(৪) জন-সম্প্রদায়, সর্বোপরি একাধিক ব্যক্তি সম্বলিত জনসমষ্টি। সুতরাং, ইহা একটি মূর্ত ধারণা।

সমিতি (Association) ঃ

যখন একাধিক ব্যক্তি এক বা একাধিক সাধারণ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ একযোগে চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে সংগঠিত হয়, তখন সমিতির জন্ম হয়।

আর. এম. ম্যাকআইভারের মতে, সমিতি হল এমন একটি সংগঠন যা তার সদস্যদের সাধারণ স্বার্থ বা স্বার্থ সমূহ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে পরিকল্পিত ভাবে গঠন করা হয়।

সমাজস্থ মানুষের বিবিধ স্বার্থ থাকে। সুতরাং সেই সমস্ত স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে তারা বহুবিধ সমিতি গঠন করে। নিম্নে এই ধরণের সমিতির কতিপয় উদাহরণ উল্লেখ করা হল।

উদাহরণ—

রাজনৈতিক সমিতি ঃ কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া, কংগ্রেস পার্টি, ভারতীয় জনতা দল প্রভৃতি।

ধর্মীয় সমিতি ঃ রামকৃষ্ণ মিশন, আর্য সমাজ, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ইত্যাদি।

ছাত্র সমিতি ঃ স্টুডেন্টস ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়া, অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী সমাজ প্রভৃতি।

পেশা ভিত্তিক সমিতি ঃ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন, দ্য ইণ্ডিয়ান বার কাউন্সিল, ওয়েস্ট বেঙ্গল কলেজ এণ্ড ইউনির্ভাসিটি টিচারস্ অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক সমিতি ঃ চেম্বার অফ কমার্স, দ্য কনসিউমারস্ কো-অপারেটিভ সোসাইটি ইত্যাদি।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) **জনগোষ্ঠী ঃ** সমিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে একটি জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব অপরিহার্য। যদিও সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বিষয়ে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা নেই, তবে সমিতি হিসাবে প্রতিপন্ন হতে গেলে এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতার ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্ক থাকা দরকার।

(২) **অভিন্ন বা সমজাতীয় উদ্দেশ্য ঃ** এক বা একাধিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সমিতি গড়ে উঠতে পারে। কিন্তু সমিতির সদস্যদের উদ্দেশ্য সমজাতীয় বা অভিন্ন হওয়া আবশ্যক।

(৩) **সহযোগিতার প্রবণতা ঃ** সমিতির উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সমিতির সকল সদস্যকে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে সমবেতভাবে উদ্যোগী হতে হয়। সুতরাং সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতার প্রবণতা না থাকলে সমিতি গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

(৪) **সংগঠন ঃ** প্রত্যেক সমিতির একটি নির্দিষ্ট সাংগঠনিক ব্যবস্থা থাকে। সমিতির সমস্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয় সুনির্দিষ্ট কর্মপদ্ধতি অনুসারে এবং পরিচালিত হয় দায়িত্বশীল নির্দিষ্ট কর্মকর্তা ও পরিচালকমণ্ডলী দ্বারা।

(৫) **স্বতন্ত্র সত্তা ঃ** সমিতি তার সদস্যবর্গের নিছক সমাবেশ মাত্র নয়। এর স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বর্তমান। সমিতি তার সদস্যদের আচরণবিধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। সমিতির স্বতন্ত্র ক্ষমতা, বিষয়-সম্পত্তি, অর্থভাণ্ডার, কর্মপদ্ধতি, নিয়ম-বিধি থাকে, যা তার সদস্যরা ব্যক্তিগত স্বার্থে ব্যবহার, অপচয় বা উল্লঙ্ঘন করতে পারে না।

(৬) **আপেক্ষিক স্থায়িত্ব ঃ** এক বা একাধিক উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে সমিতির স্থাপিত হয়। যদি একটিমাত্র এবং সাময়িক প্রকৃতির উদ্দেশ্য নিয়ে সমিতি স্থাপিত হয় তবে উদ্দেশ্যপূরণের পরই সমিতির অবলুপ্তি ঘটে। আবার কোন সমিতির উদ্দেশ্যের যদি ধারাবাহিকতা থাকে তবে তা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘস্থায়ী হয়।

(৭) **ভাবের আদান প্রদান ঃ** অধ্যাপক গিডিংসের মতে, সমিতিগুলি সমাজে তাদের সদস্যদের মধ্যে ভাব বিনিময় বা আদান-প্রদানের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসাবে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করে।

জন সম্প্রদায় (Community) এবং সমিতি (Association)-এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

জন সম্প্রদায়	সমিতি
(১) সাধারণ ভাবে জন সম্প্রদায় একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠী, যার মধ্যে একাধিক সমিতির অবস্থান সম্ভব।	(১) সমিতি সাধারণতঃ ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী যা কোন জন-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে সমাজে জন-সম্প্রদায় নিরপেক্ষ সমিতির অবস্থান ও সম্ভব।
(২) জন-সম্প্রদায়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলের সম্পর্ক ওতপ্রোত।	(২) সমিতি অঞ্চলভিত্তিক হতে পারে বা নাও হতে পারে।
(৩) জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যক্তি তার জীবনের সামগ্রিকতা বা পূর্ণতা উপলব্ধি করতে পারে। জনসম্প্রদায়ের উদ্দেশ সেভাবে নির্দিষ্ট নয়।	(৩) নির্দিষ্ট সমজাতীয় বা অভিন্ন স্বার্থ বা উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই সমিতি গড়ে ওঠে।
(৪) জনসম্প্রদায়ের অপরিহার্য উপাদান হল 'জন সম্প্রদায় গত মানসিকতা' বা 'আমরা-বোধ'।	(৪) সমিতির ক্ষেত্রে 'আমরা-বোধ' এতটা অপরিহার্য নয়।
(৫) ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক জনসম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারে না।	(৫) ব্যক্তি একই সঙ্গে একাধিক সমিতির সদস্য হতে পারে।
(৬) জনসম্প্রদায় একটি স্থায়ী জনগোষ্ঠী।	(৬) সমিতির স্থায়িত্ব আপেক্ষিক।
(৭) জনসম্প্রদায়ের সদস্যপদ ঐচ্ছিক নয়।	(৭) সমিতির সদস্যপদ ঐচ্ছিক।

গোষ্ঠী (Social Group) ঃ

আমরা অনেক সময়ই বলে থাকি, সমাজতত্ত্ব হল 'গোষ্ঠী' সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পঠনপাঠন (জনসন ১৯৬০)। কিন্তু বাস্তবে 'গোষ্ঠী'-কে সঠিক ধারণা সহ সংজ্ঞায়িত করার ক্ষেত্রে বহু জটিলতার সম্মুখীন হতে হয়। ম্যাক আইভার এবং পেজ (১৯৪৯)-এর মতে, গোষ্ঠী বলতে আমরা এমন এক মানব সমষ্টিকে বোঝাই, যাদের প্রত্যেকে অপরে সঙ্গে নির্দিষ্ট সামাজিক সম্পর্কে আবদ্ধ থাকে। অগবার্ন এবং নিমকফের (১৯৫৫) মতানুসারে, যখন দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হয় এবং পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে তখন তারা গোষ্ঠী রচনা করে।

সামাজিক গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সামাজিক গোষ্ঠীর ধারণাকে অন্যান্য সামাজিক সমষ্টি বা সামাজিক গণ (Category)-এর ধারণা থেকে পৃথক করে। অধ্যাপক হর্টন এবং হান্ট (১৯৬৪) তাঁদের *সোসিওলজি* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, গোষ্ঠী হল এমন এক মানব সমষ্টি বা গণ যেখানে প্রতিটি ব্যক্তি তার গোষ্ঠী সদস্যপদ এবং মিথস্ক্রিয়ার ধরণ সম্পর্কে

সচেতন। অর্থাৎ বলা যায়, সমস্ত গোষ্ঠী দুই বা ততোধিক ব্যক্তি সম্বলিত গণ এবং সর্বোপরি মানব সমষ্টির অন্তর্গত কিন্তু সামাজিক গণ এবং সামাজিক সমষ্টি মাত্রই গোষ্ঠী নয়। সাধারণভাবে সামাজিক গোষ্ঠীকে নিম্নলিখিত উপায়ে সংজ্ঞায়ত করা যায় ঃ

সামাজিক গোষ্ঠী হল এমন এক ব্যক্তি সমষ্টি যার সদস্যপদ আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক দু-প্রকারের হতে পারে; যার সদস্যদের মধ্যে ঐক্যবোধ বর্তমান; যার সদস্যগণ নির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলা, মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশাসমূহকে যৌথভাবে প্রতিপালন করে এবং পরস্পরের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতির মিথস্ক্রিয়া দ্বারা যুথবদ্ধ হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) সামাজিক গোষ্ঠী হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তির সমষ্টি। অতএব এটি একটি মূর্ত ধারণা।

(২) গোষ্ঠী সদস্যদের মধ্যে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ ভাবে নির্দিষ্ট ধরণের নিয়মিত এবং সচেতন মিথস্ক্রিয়া বর্তমান।

(৩) সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান (reciprocity) বর্তমান। [সাধারণ উত্তেজনা এবং অর্থপূর্ণ প্রতিক্রিয়ার বিনিময়]।

(৪) কিছু সাধারণ স্বার্থ বা উদ্দেশ্য বর্তমান।

(৫) একটি নির্দিষ্ট মাত্রার একতা-বোধ (একই ধরণের নিয়মশৃঙ্খলা, মূল্যবোধ এবং প্রত্যাশা সমূহ) বর্তমান।

(৬) পারস্পরিক সচেতনতা এবং বোঝাপড়া বর্তমান।

(৭) সমষ্টিগত আচরণ।

সামাজিক গোষ্ঠী কখনোই স্থবির নয়, আকৃতি এবং কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে সততঃ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ জঙ্গম।

প্রকার ভেদ ঃ

সংখ্যা এবং বিভিন্নতার ব্যাপ্তীতে সামাজিক গোষ্ঠী অগণ্য। সুতরাং বিজ্ঞানসম্মত পঠনপাঠনের স্বার্থে সামাজিক গোষ্ঠীর ধারণাকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা উপাদানগত ভিন্নতার ভিত্তিতে নিম্নলিখিত কতকগুলি ভাগে ভাগ করা হয় ঃ

(১) **অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহির্গোষ্ঠী ঃ** অধ্যাপক ডব্লু. জি. সামনার তাঁর *ফোকওয়েস* (Folkways of Studies) নামক গ্রন্থে দু'প্রকার সামাজিক গোষ্ঠীর উল্লেখ করেন---অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহিগোষ্ঠী। অন্তর্গোষ্ঠী বলতে সেই গোষ্ঠীকে বোঝানো হয় যে গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নির্দিষ্ট অবস্থা, বৈশিষ্ট্য এবং কারণ-এর প্রেক্ষীতে তীব্র আমরা-বোধ এবং গোষ্ঠীর সঙ্গে সুদৃঢ় একাত্মবোধ গড়ে ওঠে। উক্ত অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের নিকট একই অবস্থা, বৈশিষ্ট্য কারণের প্রেক্ষীতে অপরাপর গোষ্ঠীসমূহ, হল বহির্গোষ্ঠী, যার প্রতি ঐ অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যদের সমষ্টিগত মনোভাব এবং আচরণ সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা থেকে শুরু করে চূড়ান্ত বৈরীতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

উদাহরণ ঃ বাঙাল এবং ঘটি (এদেশীয়); ফুটবল ক্লাব মোহনবাগানের সমর্থক গোষ্ঠী এবং ইষ্টবেঙ্গলের সমর্থক গোষ্ঠী। অন্তর্গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীকে সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠতর, যোগ্যতর নির্ভরযোগ্য বলে মনে করে, অপরদিকে বহিগোষ্ঠী মাত্রই তাদের নিকট শ্রেষ্ঠত্ব, যোগ্যতা, নির্ভরতা ইত্যাদির বিচারে গৌণতর বা নিকৃষ্ট।

(২) **প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী ঃ** সদস্যদের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার প্রকৃতি ও ধরণ এবং সামাজিক সংযোগের নৈকট্য অনুসারে গোষ্ঠীকে দু'প্রকারে বিভক্ত করা হয় ঃ প্রাথমিক গোষ্ঠী এবং গৌণ গোষ্ঠী। সি. এইচ. কুলে এই 'প্রাথমিক গোষ্ঠী' ধারণাটির জনক। ***সোস্যাল অর্গানাইজেশন*** (Social Organisation) গ্রন্থে অধ্যাপক কুলে বলেছেন, যে সকল ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সংযোগ বর্তমান, অর্থাৎ যাদের মধ্যে নিয়মিত সাক্ষাৎ ঘটে, যারা পারস্পরিক সাহচর্য এবং সহায়তা প্রদান করেন এবং যাদের মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি ভিত্তিক সংযোগ বর্তমান, সেই ধরণের গোষ্ঠীকে প্রাথমিক গোষ্ঠী বলে। প্রাথমিক গোষ্ঠী সমস্ত সমাজেই অবস্থান করে। উদাহরণ ঃ পরিবার, বন্ধুগোষ্ঠী, আত্মীয় গোষ্ঠী ইত্যাদি।

অধ্যাপক কিংসলে ডেভিস, অগবার্ণ, মাকআইভার প্রমুখ সমাজতাত্ত্বিক গণ 'গৌণ গোষ্ঠী' ধারণাটির প্রচলন করেন। তাঁদের মতে, প্রাথমিক নয়, এমন যে কোন গোষ্ঠীই হল গৌণ গোষ্ঠী, আধুনিক জটিলতর শিল্পসমাজে গৌণ গোষ্ঠীর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সাধারণতঃ বৃহত্তর আকৃতিযুক্ত এবং আনুষ্ঠানিকতা দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ যে সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যদের মধ্যে নৈর্ব্যক্তিক, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, বিশেষীকৃত সংযোগ এবং পারস্পরিক আদান-প্রদান বর্তমান সেই সমস্ত গোষ্ঠীকে গৌণ গোষ্ঠী বলা হয়। উদাহরণ ঃ নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, একটি বিশেষ পেশাভিত্তিক সমিতি, রোটারি ক্লাব, লায়ন্স ক্লাব ইত্যাদি।

(৩) **জেমেইনস্যাফট (Gemeinschaft) বা জনসম্প্রদায় এবং জেসেলস্যাফট (Gesellschaft) বা সমিতি ঃ** জার্মান সমাজতত্ত্ববিদ ফার্দিনান্দ টোনিস সামাজিক গোষ্ঠীকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন-জেমেইনস্যাফট বা জনসম্প্রদায় এবং জেসেলস্যাফট বা সমিতি।

অধ্যাপক টোনিস-এর মতানুসারে, জেমেইনস্যাফট-এর বৈশিষ্ট্য হল এক ধরণে নিজস্ব, নৈকট্যপূর্ণ, অনৈর্ব্যক্তিক যৌথ জীবনযাত্রা, জেমেইনস্যাফট বলতে এমন একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝায় যার সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক ব্যক্তিগত স্তরে নিয়মিত প্রত্যক্ষ সংযোগ বর্তমান এবং যারা মনে করে তাদের জীবনযাত্রার জন্য প্রয়োজনীয় প্রা সমস্ত কিছু তাঁদের গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। পরিবার, আত্মীয়গোষ্ঠী, প্রতিবেশী গোষ্ঠী প্রভৃতি জেমেইনস্যাফট-এর অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে, জেসেলস্যাফট বা সমিতি হল এমন এক গোষ্ঠী যা যৌক্তিক স্বার্থভিত্তিক চুক্তি দ্বারা ঐক্যবদ্ধ এখানে সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষ প্রয়োজন-ভিত্তিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত (বিশেষতঃ অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য)। ব্যক্তিবর্গ বিশেষ সাধারণ স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে এ জাতীয় গোষ্ঠীর সদস্যপদ গ্রহণ করে। এই জাতীয় গোষ্ঠী সাধারণতঃ সদস্যদের সমগ্র জীবনচর্যাকে প্রভাবিত করে না। উদাহরণ একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, ক্লাব ইত্যাদি।

(৪) **ক্ষুদ্র গোষ্ঠী এবং বৃহৎ গোষ্ঠী ঃ** অধ্যাপক জর্জ সিমেল আকারের ভিত্তিতে গোষ্ঠীর প্রকার ভেদ

করেছেন। 'ডায়াড' (dyad) অর্থাৎ দুই জন ব্যক্তি সম্বলিত গোষ্ঠী, 'ট্রায়াড' (triad) অর্থাৎ তিন জন ব্যক্তি সম্বলিত গোষ্ঠী প্রভৃতি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর অন্তভুক্ত। বৃহত্তর গোষ্ঠী বলতে জাতিগোষ্ঠী, রাজনৈতিক গোষ্ঠী, বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠী ইত্যাদি বৃহৎ সামাজিক সমষ্টিকে বোঝানো হয়।

(৫) **স্বেচ্ছাজনিত গোষ্ঠী এবং বাধ্যতামূলক গোষ্ঠী ঃ** সদস্য অন্তর্ভুক্তির নিয়ম অনুসারে সামাজিক গোষ্ঠী এই দু'প্রকারে বিভক্ত। চার্লস এ. এলউড-এর ***সাইকোলজি অফ হিউম্যান সোসাইটি*** **(১৯২৫)** গ্রন্থানুসারে, যে সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যপদ ব্যক্তির জন্মসূত্রে নির্ধারিত হয়, ব্যক্তির নিজস্ব ইচ্ছানুসারে নয়, সেইসমস্ত গোষ্ঠীকে বাধ্যতামূলক গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** পরিবার, জনসম্প্রদায়, জাতি, বর্ণ-ভিত্তিক গোষ্ঠী ইত্যাদি। অপরপক্ষে, যে সমস্ত গোষ্ঠীতে ব্যক্তিবর্গ নিজ ইচ্ছানুযায়ী পরিকল্পনাপূর্বক সদস্যপদ গ্রহণ করে, সেইসমস্ত গোষ্ঠীকে স্বেচ্ছাজনিত গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি।

(৬) **স্থায়ী গোষ্ঠী এবং অস্থায়ী গোষ্ঠী ঃ** অধ্যাপক এলউড স্থায়িত্বের ভিত্তিতে সামাজিক গোষ্ঠীকে দু'ভাগে বিভক্ত করেন—স্থায়ী গোষ্ঠী ও অস্থায়ী গোষ্ঠী। যে সমস্ত গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত বেশী স্থায়ী এবং যেখানে সদস্যদের অন্তভুক্তি বা বহির্গমন চললেও তা গোষ্ঠীর অবস্থান ও স্থায়িত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে না, সেই সকল গোষ্ঠীকে স্থায়ী গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** পরিবার, চার্চ, ধর্মীয় গোষ্ঠী ইত্যাদি এই সকল গোষ্ঠী সাধারণতঃ প্রাতিষ্ঠানিক অর্থাৎ স্থায়ী প্রকৃতির নিয়মকানুন দ্বারা শৃঙ্খলাবদ্ধ। অপরদিকে, অপেক্ষাকৃত কম স্থায়িত্ব সম্পন্ন গোষ্ঠী অর্থাৎ যেখাে সদস্যরা নির্দিষ্ট উদ্দেশপূরণের জন্য একত্রিত হয় এবং উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেলেই গোষ্ঠী ভেবে যায় তাকে অস্থায়ী গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** দর্শক গোষ্ঠী, শ্রোতৃমণ্ডলী, পাড়ার আড্ডা গোষ্ঠী ইত্যাদি। এই সকল গোষ্ঠী প্রাতিষ্ঠানিক হয় না। প্রাতিষ্ঠানিকতার ভিত্তিতেও এলউড সামাজিক গোষ্ঠীকে দু'টি ভাগে বিভক্ত করেন ঃ প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক গোষ্ঠী।

(৭) **আঞ্চলিক গোষ্ঠী এবং অনাঞ্চলিক গোষ্ঠী ঃ** রবার্ট পার্ক এবং বার্জেস সামাজিক গোষ্ঠীকে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিত্তিতে দু'ভাগে বিভক্ত করেন—আঞ্চলিক গোষ্ঠী (**উদাঃ** জনসম্প্রদায়, রাষ্ট্র) এবং অনাঞ্চলিক গোষ্ঠী (**উদা ঃ** শ্রেণী, জাতি, বর্ণভিত্তিক গোষ্ঠী, ধর্মভিত্তিক গোষ্ঠী ইত্যাদি)।

(৮) **আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী এবং আনুষ্ঠানিকতাহীন গোষ্ঠী ঃ** যে সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যপদ প্রাপ্তি, সদস্যদের আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছদ দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য ইত্যাদি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট সুদৃঢ় নিয়মাবলী বর্তমান সেই সকল গোষ্ঠীকে আনুষ্ঠানিক গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** আমলাতান্ত্রিক গোষ্ঠী, ক্যালকাটা ক্লাব, প্রেস ক্লাব ইত্যাদি। অপরপক্ষে, যে সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যপদ প্রাপ্তি, সদস্যদের আচার-আচরণ, কর্মবিধি, দায়-দায়িত্ব প্রভৃতি সংক্রান্ত কঠোর লিখিত নিয়মাবলী থাকে না, তাদের আনুষ্ঠনিকতাহীন গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** পরিবার, পাড়ার ক্লাব, আড্ডা গোষ্ঠী, বন্ধু গোষ্ঠী ইত্যাদি।

(৯) **মুক্ত গোষ্ঠী এবং বদ্ধ গোষ্ঠী ঃ** যে সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যপদ জন্মসূত্রে নির্ধারিত, ব্যক্তিবর্গের স্বেচ্ছায় প্রাপ্ত বা অর্জিত নয়, সেই সমস্ত গোষ্ঠীকে বদ্ধ গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** জাতি গোষ্ঠী। অপরপক্ষে, যে সমস্ত গোষ্ঠীর সদস্যপদ ব্যক্তিবর্গ নিজ যোগ্যতায় অর্জন করে, সেই সমস্ত গোষ্ঠীকে মুক্ত গোষ্ঠী বলে। **উদাহরণ ঃ** শ্রেণী।

(১০) **নির্দেশক গোষ্ঠী ঃ** মুস্তাফা শেরিফ তাঁর রচিত ***অ্যান আউটলাইন অফ সোস্যাল সাইকোলজি*** (১৯৪৮) নামক গ্রন্থে প্রথম 'নির্দেশক গোষ্ঠী'-র ধারণাটি উল্লেখ করেন। রবার্ট কে মার্টন ও তাঁর তত্ত্বে নির্দেশক গোষ্ঠী এবং মিথস্ক্রিয়াজাত গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্যের উল্লেখ করেছেন। ক্ষুদ্র গোষ্ঠী সম্পর্কিত আলোচনায় সদস্য গোষ্ঠীর (ব্যক্তি যে গোষ্ঠীর সদস্য সেই গোষ্ঠীকে ঐ ব্যক্তির সদস্যগোষ্ঠী বলে।) বিপরীত ধারণা রূপে তিনি নির্দেশক গোষ্ঠীর ধারণাটি উল্লেখ করেছেন।

কোন একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠী বা তার সদস্যগণ এবং তাদের মূল্যবোধ, আচার আচরণ ও নৈতিকতা এবং কার্যপ্রণালী যখন অপর কোন গোষ্ঠী বা তার সদস্যদের নিকট তুলনামূলক যোগ্যতা নির্ণয়ের মানদণ্ড হয়ে ওঠে, অথবা দ্বিতীয় গোষ্ঠীর সদস্যগণ প্রথম গোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্তি বা প্রথম গোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্নতা বজায় রাখার জন্য নিজেদের আচরণে প্রয়োজনানুগ পরিবর্তন সাধন করে, তখন প্রথম গোষ্ঠীকে দ্বিতীয় গোষ্ঠীর নির্দেশক গোষ্ঠী বলা হয়।

উদাহরণ ঃ উচ্চাকাঙ্খী উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সদস্যরা সর্বদা উচ্চ-শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হওয়ার প্রচেষ্টায় উচ্চ-শ্রেণীর অনুকরণ করে।

শেতাঙ্গ গোষ্ঠীর মানুষ কৃষ্ণাঙ্গদের থেকে দূরত্ব এবং ভিন্নতা বজায় রাখার চেষ্টা করে। আবার কৃষ্ণাঙ্গরাও শ্বেতাঙ্গদের থেকে তাদের গোষ্ঠীগত আচরণ পৃথক রাখার চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে উপরোক্ত দু'টি গোষ্ঠীই একে অপরের নির্দেশক গোষ্ঠী।

প্রতিষ্ঠান (Institution) ঃ

'প্রতিষ্ঠান'-এর ধারণা সমাজতত্ত্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতত্ত্ববিদ্ দুর্খাইমের মতে, সমাজতত্ত্ব আসলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রান্ত বিজ্ঞানভিত্তিক পঠন-পাঠন।

সংজ্ঞা ঃ

ম্যাক আইভার এবং পেজ এর মতে, গোষ্ঠীগত কার্যাবলীর প্রতিষ্ঠিত আকার বা পদ্ধতিগত শর্তাবলীকে প্রতিষ্ঠান রূপে সংজ্ঞায়িত করা যায়। অধ্যাপক জিনসবার্গ এর মতে, স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠালব্ধ ব্যবহারবিধি এবং রীতিনীতি যা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ককে নিয়ন্ত্রণ করে তাকে প্রতিষ্ঠান বলে।

অধ্যাপক কিংসলে ডেভিসের মতে, এক বা একাধিক সামাজিক কর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সুসংবদ্ধ লোকপ্রথা, লোকনীতি এবং আইনকানুনকে একত্রে প্রতিষ্ঠান রূপে সংজ্ঞায়িত করা হয়।

বৈশিষ্ট্য এবং গুরুত্ব ঃ

(১) প্রতিষ্ঠান বলতে স্বীকৃত এবং প্রতিষ্ঠালব্ধ ব্যবহারবিধি, রীতি-নীতি এবং আইন-কানুনকে বোঝায়। সুতরাং ইহা একটি বিমূর্ত ধারণা।

(২) সার্বজনীনতা ঃ পৃথিবীর সর্বত্র এবং সমাজ বিবর্তনের সর্বস্তরেই প্রতিষ্ঠান এর উপস্থিতি অপরিহার্য। পরিবার, বিবাহ, ধর্ম, সম্পত্তি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর প্রাচীনতম সমাজ এবং আদিবাসী সমাজগুলিতেও উপস্থিত।

(৩) **প্রমিত বা নির্ধারিত বিধি ব্যবস্থা ঃ** প্রতিষ্ঠান সমাজে গোষ্ঠীগত কার্যাবলী সম্পাদনের নিয়মকানুন, আচরণবিধি প্রভৃতি নির্দেশ করে। উদাঃ বিবাহ একটি প্রতিষ্ঠান যা স্বামী-স্ত্রী-র সম্পর্ক, দায়দায়িত্ব এবং আচরণবিধির নির্দেশক।

(৪) **সমাজে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের পন্থা ঃ** সমাজে মানুষ কিছু মৌলিক এবং অত্যাবশ্যক চাহিদা পূরণের নিমিত্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে। মৌলিক প্রয়োজনগুলি হল—(ক) আত্ম সংরক্ষণের প্রয়োজন; (খ) স্থায়িত্বের প্রয়োজন; এবং (গ) প্রকাশের প্রয়োজন।

(৫) **নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম ঃ** ধর্ম, নৈতিকতা, রাষ্ট্র, সরকার, আইন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমাজে ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলতঃ সামাজিক শৃঙ্খলা এবং স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

(৬) **অপেক্ষাকৃত স্থায়ী প্রকৃতি ঃ** সাধারণতঃ প্রতিষ্ঠানগুলি আকস্মিকভাবে দ্রুত পরিবর্তনশীল নয়। প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ অনমনীয় এবং স্থায়ী প্রকৃতির হয়। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে অত্যন্ত ধীর গতিতে প্রতিষ্ঠানগুলিতে পরিবর্তন সম্পাদিত হয়। ফলে, প্রতিষ্ঠান একটি সমাজের রক্ষণশীল উপাদান হিসাবে প্রতিভাত হয়। যথা ঃ জাতি, ধর্ম প্রভৃতি। অবশ্য সময়ের সাথে সাথে ঘটনাপ্রবাহের চাপে প্রতিষ্ঠানগুলি ও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে।

(৭) **মৌখিক এবং লিপিবদ্ধ উভয়প্রকারে অবস্থান ঃ** সমাজে প্রতিষ্ঠান লিখিত বা অলিখিত উভয় রূপেই অবস্থান করে। আদিম সমাজের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানগুলি মূলতঃ অলিখিত প্রকৃতির। আধুনিক সমাজে লিখিত এবং অলিখিত উভয় রূপেই প্রতিষ্ঠান অবস্থান করে। সংবিধান, ধর্মগ্রন্থ, পাঠক্রম, সরকারি নির্দেশনামা, ব্যবসায়িক চুক্তিপত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের লিখিত রূপ। লোকপ্রথা বা লোকাচার-এর সাধারণতঃ লিখিত রূপ থাকে না।

(৮) **অন্তঃসংযোগ ঃ** সমাজে বিবিধ প্রতিষ্ঠান সমূহ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং পরস্পর নির্ভরশীল। সমাজে ধর্মীয়, নৈতিক, শিক্ষাভিত্তিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং অন্যান্য সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, পরস্পর নির্ভরশীল এবং সুসংবদ্ধ।

প্রকারভেদ ঃ

প্রতিষ্ঠানকে সাধারণতঃ দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়—(১) প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান এবং (২) গৌন প্রতিষ্ঠান।

আদিমতম সমাজ থেকে শুরু করে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাতেও যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান-এর ধারাবাহিক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তাদের প্রাথমিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। উদাঃ পরিবার, ধর্ম, বিবাহ ইত্যাদি।

সমাজের আকার এবং জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানগুলিও উন্নততর এবং বিবিধ রূপ পরিগ্রহণ করেছে। মানুষের বহুবিধ চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে বিবিধ প্রতিষ্ঠান পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে। এইসমস্ত পরবর্তীকালে বিবর্তিত প্রতিষ্ঠান সমূহকে গৌণ প্রতিষ্ঠান বলা হয়। উদাঃ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পরীক্ষা ব্যবস্থা, আইন, সংবিধান, সংসদীয় বিধি ইত্যাদি।

অধ্যাপক সামনার প্রতিষ্ঠানকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিষ্ঠান (Crescive institutions) এবং পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান (enacted institution)। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত এবং অচেতনভাবে গড়ে উঠেছে তাদের স্বতঃস্ফূর্ত (crescive) প্রতিষ্ঠান বলে। অপরপক্ষে, সমাজে মানুষ বিভিন্ন লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সচেতন এবং পরিকল্পিতভাবে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করেছে তাদের পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান বলা হয়। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণভাবে প্রাথমিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। অপরপক্ষে, পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান-এর ধারণাটি গৌণ প্রতিষ্ঠান-এর ধারণার প্রায় সমরূপ।

সমিতি এবং প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্য ঃ

সমিতি	প্রতিষ্ঠান
(১) সমিতি বলতে দুই বা ততোধিক ব্যক্তিবর্গের এমন এক একত্র সম্মিলিত অবস্থানকে বোঝায়, যার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্তমান।	(১) সমিতিগুলির উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত রচিত কর্মবিধি, কার্যপদ্ধতি প্রভৃতি হল প্রতিষ্ঠান।
(২) সমিতি একটি মূর্ত ধারণা।	(২) প্রতিষ্ঠান একটি বিমূর্ত ধারণা।
(৩) সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তিবর্গ সমিতির সদস্য হতে পারে।	(৩) প্রতিষ্ঠানের সদস্য হওয়া যায় না, সমিতির সদস্যগণের কার্যাবলি ও আচরণ প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
(৪) সমিতি সৃষ্টি হয় কোন সাধারণ বা অভিন্ন স্বার্থের পরিপ্রেক্ষীতে।	(৪) সামাজিক সংঘ সমূহের উদ্দেশ্য চরিতার্থ ও অস্তিত্ব অব্যাহত রাখার জন্য প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি হয়।
(৫) সামাজিক সমিতি যেহেতু অভিন্ন স্বার্থপূরণের নিমিত্ত বহু ব্যক্তির একত্রীকরণ, তাই এর বিষয়ীগত / আত্মগত (subjective) এবং বিষয়গত (objective) দিক— উভয় দিকই বর্তমান।	(৫) সামাজিক প্রতিষ্ঠান-এর কোন আত্মগত / বিষয়ীগত (subjective) দিক থাকে না।

দ্বিতীয় একক (Unit – II) ☐ সামাজিক প্রতিষ্ঠান (Social Institution)

ভিত্তিমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহ (Basic types of Institutions) ঃ

সমাজতত্ত্বের আলোচনায় সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রোফেসর এমিল দুর্খাইমের মতে, সমাজতত্ত্ব হল 'সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বিজ্ঞান'।

সমাজতত্ত্বের মূল কাজ হল সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধরণ ও ক্রিয়া বিশ্লেষণ করা (কোয়েনিগ-১৯৭০)। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহের বৈজ্ঞানিক অধ্যায়ন ব্যতীত মানব সমাজের ধরণ ও প্রকৃতি সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান অর্জন অসম্ভব। সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলির বস্তুনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বাস্তব সামাজিক জীবন দৃষ্টিগোচর হয়ে ওঠে।

পূর্ববর্তী এককে, সমাজতত্ত্বে ব্যবহৃত প্রধান ধারণাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রচলিত অর্থে প্রতিষ্ঠান শব্দটি সংগঠন-এর সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হলেও, সমাজতাত্ত্বিক পরিভাষা অনুসারে প্রতিষ্ঠান বলতে সংগঠন দ্বারা অনুসৃত, স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতিকে বোঝানো হয়। একত্র জীবনযাপনের অভ্যাসগত বিষয় সমূহ যা জনসম্প্রদায় কর্তৃক স্বীকৃত, সুব্যবস্থিত ও প্রতিষ্ঠিত তাকেই প্রতিষ্ঠান বলা হয় (এলউড ১৯২৫)।

বিভিন্ন প্রকার সামাজিক প্রতিষ্ঠান ঃ

বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে প্রতিষ্ঠান সমূহের শ্রেণীবিন্যাস রচনা করেছেন। তাঁদের মতামতগুলি বিবেচনা সাপেক্ষে এবং আলোচনার সুবিধার্থে বর্তমান এককে সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমূহকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে তাদের সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হল ঃ

(১) বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান (পারিবারিক প্রতিষ্ঠান এবং আত্মীয় সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান গঠন, সন্তান প্রতিপালন, উত্তরাধিকার নির্দিষ্টকরণ প্রভৃতি ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়-দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজনী বিধি সমূহ)

(২) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের বস্তুগত প্রয়োজন পূরণের উদ্দেশে উদ্ভূত কার্যপ্রণালী)

(৩) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান (সমাজে সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থা, আইনশৃঙ্খলা সংরক্ষণ প্রভৃতি উদ্দেশ্যে উদ্ভূত কার্যপ্রণালী)

(৪) শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান।

(৫) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান।

বৈবাহিক প্রতিষ্ঠান (Marriage) ঃ

বিবাহ এমন একটি সার্বজনীন এবং ভিত্তিমূলক সামাজিক প্রতিষ্ঠান যার মাধ্যমে সমাজে নর-নারীর বিশেষ সম্পর্ক সামাজিক বৈধতা, স্বীকৃতি ও অনুমোদন লাভ করে, সমাজের ক্ষুদ্রতম একক অর্থাৎ পরিবার গঠনে সাহায্য করে।

সংজ্ঞা ঃ

ম্যালিনাওস্কির মতানুসারে, বিবাহ হল সন্তান প্রজনন ও প্রতিপালনের চুক্তি বিশেষ।

এডওয়াড ওয়েস্টারমার্ক-এর মতে, বিবাহ হল নর-নারীর মধ্যে এমন এক সম্পর্ক যা কম-বেশী স্থায়ী এবং যা অন্তত সন্তান জন্মলাভ করার পরবর্তী সময় পর্যন্ত স্থায়ী হয়। তাঁর মতে, বিবাহ হল এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে এক বা একাধিক নারীর যৌন সম্বন্দ যা সামাজিক প্রথা বা আইন দ্বারা বৈধতা প্রাপ্ত এবং যা উক্ত নর-নারী এবং তাদের সন্তানদের জন্য কিছু দায়-দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্য স্থির করে দেয়।

A Dictionary of sociology গ্রন্থে অধ্যাপক ডানকান মিচেল বলেছেন, বিবাহ হল দুই বা ততোধিক বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির মধ্যে স্থাপিত সমাজ স্বীকৃত যৌন সম্পর্ক যার স্থায়িত্ব গর্ভধারণ এবং সন্তাদ প্রজননের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমাকে অতিক্রম করে যায়।

এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে, বিবাহকে দু'প্রকারে সংজ্ঞায়িত করা সম্ভব—প্রথমতঃ, ইহা এক প্রকার অনুষ্ঠান, প্রক্রিয়া বা প্রণালী যার মাধ্যমে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের বৈধতা প্রাপ্তি ঘটে; দ্বিতীয়তঃ, ইহা নর-নারীর একপ্রকার দৈহিক/বস্তুগত, আইনগত এবং নৈতিক মিলন, যার উদ্দেশ্য জীবনের পরিপূর্ণ সংহতির মধ্য দিয়ে পারিবার স্থাপন করা।

বিবাহের বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

(১) **সার্বজনীনতা ঃ** অতীত কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি আধুনিক বিশ্বে, পৃথিবীর যে কোন অংশে এমন সমাজ-এর অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি যেখানে কোন না কোন রূপে বিবাহ ব্যবস্থা অনুপস্থিত।

(২) **স্থায়িত্ব ঃ** বিবাহ নারী পুরুষের মধ্যে কম বেশী স্থায়ী বন্ধন। ইহা সন্তান-সন্ততির জন্মদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমাকে অতিক্রম করে যায় এবং বহু ক্ষেত্রেই এই সম্পর্ক আ-মৃত্যু স্থায়ী হয়।

(৩) **সামাজিক স্বীকৃতি ঃ** দুই বা ততোধিক বিপরীত লিঙ্গ সম্পন্ন ব্যক্তির মধ্যে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের সামাজিক স্বীকৃতি মেলে বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে।

(৪) **নৈতিক বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ঃ** বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির সঙ্গে সমস্ত সমাজেই কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠন বা নৈতিক বিষয়াদি যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ধর্মীয় আচারবিধির মাধ্যমে নর-নারীর যৌন সম্পর্ক সামাজিক স্বীকৃতি লাভ করে। বর্তমানে আধুনিক সমাজে বিবাহ আইন দ্বারা সিদ্ধ হয়।

(৫) **সন্তান প্রজননে বৈধতা দান ও প্রতিপালন ঃ** বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নর-নারীর সন্তান সমাজে বৈধতাপ্রাপ্ত হয় এবং তার প্রতিপালনের দায়িত্ব তার পিতা-মাতা এবং তাদের পরিবারের উপর ন্যস্ত হয়।

(৬) **নির্দিষ্ট দায় দায়িত্ব, অধিকার এবং কর্তব্য ঃ** বিবাহ স্বামী এবং স্ত্রী উভয়ের জন্যই নির্দিষ্ট কিছু দায়-দায়িত্ব এবং অধিকার নির্দিষ্ট করে, যা তাদের বৈবাহিক জীবনে যথাসম্ভব দায়িত্বের সঙ্গে পালন করে যেতে হয়।

বিবাহের প্রকার ভেদ ঃ

বিবাহ একটি সার্বজনীন এবং ভিত্তিমূল প্রতিষ্ঠান। বিভিন্ন সমাজে এর বহু রূপভেদ লক্ষ্য করা যায়।

বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নর-নারীর সংখ্যাগত অনুপাতের বৈধতার ভিত্তিতে বিবাহকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়—(১) একগামী বিবাহ, (২) বহুগামী বিবাহ, (৩) গোষ্ঠী বিবাহ।

(১) একগামী বিবাহ বা একগামীতা (Monogamy) ঃ এটি সর্বাধিক প্রচলিত ও জনপ্রিয় বিবাহ ব্যবস্থা। যে ধরণের বিবাহ ব্যবস্থায় একজন পুরুষ বা একজন নারীর একটি মাত্র বৈধ স্ত্রী বা স্বামী থাকা সম্ভব, সেই ধরণের বিবাহ ব্যবস্থাকে বলে একগামীতা।

একগামীতার সুবিধা ঃ

(ক) এই জাতীয় বিবাহ ব্যবস্থা সর্বজন স্বীকৃত এবং বৈবাহিক সন্তুষ্টি প্রদানে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয়।

(খ) একগামীতা পরিবারের স্থায়িত্ব ও স্থিতিশীলতাকে সুদৃঢ় করে। বহুগামীতার ক্ষেত্রে একাধিক স্ত্রী বা একাধিক স্বামীদের মধ্যে স্বামী বা স্ত্রীর উপর অধিকারকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, একগামীতায় সেই দ্বন্দ্ব অনুপস্থিত।

(গ) অর্থনৈতিক দিক থেকে একগামীতা পরিবারের ভার লাঘব করে। একাধিক স্বামী বা স্ত্রীর উপস্থিতি, অধিক সংখ্যক সন্তানের জন্ম প্রভৃতি বহুগামীতা ভিত্তিক পরিবারের অর্থনীতির উপর অধিক ভার অর্পন করে।

(ঘ) বয়ঃবৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবা এবং প্রতিপালন নিশ্চিত হয় একগামীতা ভিত্তিক পরিবারে। বহুগামীতার ক্ষেত্রে অনেক সময় পুরাতন, বয়স্ক স্ত্রীলোকেরা অবহেলার শিকার হন।

(২) বহুগামী বিবাহ বা বহুগামীতা (Polygamy) ঃ যে প্রকার বিবাহে এক জন পুরুষের একাধিক বৈধ স্ত্রী বা একজন নারীর একাধিক বৈধ স্বামী থাকা সম্ভব, সেই ধরণের বিবাহকে বহুগামীতা বলে। বহুগামীতা দু'ভাগে বিভক্ত—বহুপত্নীক বিবাহ (Polygyny) এবং বহুপতীত্ব বিবাহ (Polyandry)।

বহু পত্নীত্ব ঃ এ প্রকার বিবাহে একজন পুরুষের একই সঙ্গে দুই বা ততোধিক বৈধ পত্নী থাকা সম্ভব। প্রাচীন ভারত, ব্যার্লিন, আসিরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে সমাজে বহু পত্নীত্বের চল ছিল। বর্তমানে এস্কিমো, ক্রো ইণ্ডিয়ান, ভারতে নাগা, গোন্দ, বৈগা প্রভৃতি উপজাতিদের মধ্যে বহুপত্নীত্ব প্রচলিত আছে। বহু-পত্নীত্ব আবার দু'প্রকারের ঃ (১) সহোদরা বহু পত্নীত্ব এবং (২) অ-সহোদরা বহু-পত্নীত্ব। সহোদরা বহুপত্নীত্বের ক্ষেত্রে এক পুরুষের স্ত্রীরা সকলে পরস্পরের সহোদরা বা সম্পর্কে পরস্পরের ভগ্নি। যে সমস্ত উপজাতির ক্ষেত্রে উচ্চ-কন্যাপণ-এর বিনিময়ে বিবাহ সম্পন্ন হয়, সেই সমস্ত উপজাতিদের মধ্যে এ ধরনের বিবাহের প্রচলন দেখা যায়। বস্তুত প্রথম স্ত্রী মারা গেলে বা সন্তানহীনা হলে, কনাপণ-এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ উক্ত স্ত্রীর ভগ্নীদের প্রতি পুরুষটির বিবাহ অধিকার বর্তায়। অপরপক্ষে, অ-সহোদরা বহুপত্নীত্বের ক্ষেত্রে এক পুরুষের বিভিন্ন স্ত্রীগণ পরস্পরের সঙ্গে কোনরূপ ভগ্নী সম্পর্কে আবদ্ধ থাকেন না।

বহু পত্নীত্বের কারণ ঃ

(ক) সমাজে নারী এবং পুরুষের সংখ্যার আনুপাতিক ভারসাম্য না থাকলে, অর্থাৎ বিবাহযোগ্য পুরুষ অপেক্ষা নারীর সংখ্যাধিক্য হলে;

(খ) প্রথমা স্ত্রী সন্তানধারণে অক্ষম হলে, বংশরক্ষার তাগিদে;

(গ) অধিক সন্তানলাভের আশায়;

(ঘ) কিছু কিছু উপজাতির (যথা ঃ আফ্রিকার লঙ্গোম এবং থঙ্গোস উপজাতি) ক্ষেত্রে পরিবারের মহিলারা পারিবারিক অর্থনীতিতে শ্রমদানের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে তাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। ফলে পরিবারিক অর্থনীতিকে পুষ্ট করার উদ্দেশ্যে এ সমস্ত ক্ষেত্রে বহুপত্নীত্ব বিবাহ ঘটে।

(ঙ) স্ত্রী সংখ্যার আধিক্য পুরুষের মর্যাদা প্রতীক হিসাবে কোন কোন সমাজে গৃহীত হয়।

(চ) যৌন জীবনে বৈচিত্রের লক্ষ্যে, পৌরুষ প্রদর্শনের পন্থা হিসাবে কোন কোন সমাজে বহু পত্নীত্ব বিবাহ ঘটে।

বহুপতিত্ব (Polyandry) ঃ যে বিবাহ ব্যবস্থায় একজন নারীর একাধিক বৈধ স্বামী থাকতে পারে, সেই বিবাহ ব্যবস্থাকে বলে বহু পতিত্ব। ভারতের টোডা, খাসি প্রভৃতি উপজাতি, আফ্রিকার বাহমা উপজাতিদের মধ্যে এ ধরণের বিবাহের প্রচলন দেখা যায়।

বহুপতিত্ব বিবাহ দু'প্রকার ঃ

(১) **ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিত্ব (Fraternal Polyandry) ঃ** যে বিবাহ ব্যবস্থায় কোন নারীর সকল পতিগণ পরস্পর সহোদর ভাই, সেই বিবাহকে বলে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিত্ব। **উদাহরণ ঃ** ভারতে টোডা উপজাতির মধ্যে এ ধরণের বিবাহের প্রচলন আছে।

(২) **অ-ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিত্ব (Non-fraternal Polyandry) ঃ** যে বিবাহ ব্যবস্থায় একজন নারীর একাধিক বৈধ পতি থাকতে পারে এবং এই পতিগণ পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্কে সম্পর্কিত থাকে না, সেই বিবাহকে বলে অ-ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিত্ব। **উদাহরণ ঃ** ভারতে নায়ার সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ বিবাহ প্রচলিত।

বহুপতিত্বের কারণ ঃ

বহুপতিত্বযুক্ত সমাজগুলিতে সমীক্ষা চালিয়ে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নিম্নলিখিত কারণসমূহ নির্দিষ্ট করা হয়েছে—

(ক) শিশুকন্যা হত্যার কারণে সমাজে নারী সংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় বিবাহযোগ্য বয়সের নারী পুরুষের সংখ্যার আনুপাতিক ভারসাম্যের বিনাস। উদাঃ ভারতে টোডা উপজাতির ক্ষেত্রে এই ঘটনা সত্য।

(খ) পারিারিক যৌথ সম্পত্তি অখণ্ড রাখার জন্য বিশেষভাবে ভ্রাতৃত্বমূলক বহুপতিত্ব বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করে।

(গ) কোন কোন উপজাতির ক্ষেত্রে 'কন্যাপণ' বেশী হওয়ায় দরিদ্র পুরুষগণ যৌথভাবে কন্যাপণ যোগাড় করে কোন এক নারীকে বিবাহ করে। দারিদ্র্যের কারণে যৌথভাবে স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্বগ্রহণ করা ও এ সব ক্ষেত্রে বহুপতিত্ব বিবাহের কারণ।

বহুপতিত্বের অসুবিধা ঃ

(ক) সন্তানের পিতৃত্ব নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুপতিত্ব সমস্যা সৃষ্টি করে। ফলে বহুপতিত্ব বিবাহ ভিত্তিক উপজাতি সমাজে সন্তানের পিতৃত্ব স্বীকারের বা পিতৃত্ব নির্ধারণের নিজস্ব সামাজিক রীতি বা অনুষ্ঠান নির্দিষ্ট থাকে।

(খ) বহুপতিত্বের ক্ষেত্রে জন্মহার অন্যান্য বিবাহের তুলনায় কম। ফলে সমাজে এর নেতিবাচক প্রভাব থাকে।

(৩) **গোষ্ঠী বিবাহ (Group Marriage) ঃ** এই জাতীয় বিবাহের একাধিক পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এক্ষেত্রে পুরুষ গোষ্ঠীর সকলেই নারী গোষ্ঠীর সকলের বৈধ স্বামী। এধরণের বিবাহের ফলে উৎপন্ন সকল সন্তান ঐ গোষ্ঠীর সন্তান। বিবাহিত ঐ সকল পুরুষ নতুন প্রজন্মের সকলের পিতা এবং বিবাহিত সকল নারী নব প্রজন্মের সকলের মাতা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ ধরণের বিবাহ ব্যবস্থার বাস্তব উদাহরণ পাওয়া যায় না। তিব্বত, শ্রীলঙ্কা এবং অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন উপজাতিদের মধ্যে এরূপ বিবাহ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল বলে মনে করা হয়।

এছাড়াও বিবাহে পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের শর্ত, নিয়ম, পদ্ধতি এবং রীতির বিচারে বিবাহকে নিম্নবর্ণিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়—

(১) **অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ (Endogamy) এবং বহির্গোষ্ঠী বিবাহ (Exogamy) ঃ** যে বিবাহ ব্যবস্থায় পাত্র এবং পাত্রী উভয়কেই একই গোষ্ঠীর (উদা ঃ জাতি, শ্রেণী, উপজাতি, ধর্ম ইত্যাদি) সদস্য হতে হয়, তাকে অন্তর্গোষ্ঠী বিবাহ বা স্বগোষ্ঠী বিবাহ বলে। এ জাতীয় বিবাহ গোষ্ঠী সংহতি সংরক্ষণে সহায়ক এবং গোষ্ঠীর নিজস্ব রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-লোকাচার প্রভৃতি সংরক্ষণ করে থাকে। অপর দিকে, বহির্গোষ্ঠী বিবাহ বা স্বগোষ্ঠী বহিভূত বিবাহ ব্যবস্থায় পাত্র-পাত্রীকে আলাদা-আলাদা গোষ্ঠীর সদস্য হতে হয়। যথা—গোত্র বহির্ভূত বিবাহ (হিন্দুদের মধ্যে স্বগোত্রে বিবাহ নিষিদ্ধ), 'সপিণ্ড' বহির্ভূত বিবাহ (পিণ্ডদানে সক্ষম আত্মীয় গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ), গ্রাম-বহির্ভূত বিবাহ (নাগা, গারো, মুণ্ডা প্রভৃতি উপজাতিরা নিজ গ্রামের মধ্যে বিবাহ স্থির করে না) ইত্যাদি। নিকট সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ ঘটে যাতে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জৈব-গুণাগুণ (biological quality) নষ্ট হয়ে না যায়, তা নিশ্চিত করার জন্য গোষ্ঠী-বহির্ভূত বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া মুক্ত সমাজে যেখানে অর্জিত মর্যাদার গুরুত্ব আরোপিত মর্যাদা অপেক্ষা বেশী সেখানে স্বগোষ্ঠী বিবাহের সামাজিক অনুশাসন অনেকটাই শিথিল।

জাতি-ব্যবস্থা প্রাচীন ভারতে যখন অনমনীয় ছিল এবং স্বজাতি বিবাহ যেখানে ছিল সমাজ স্বীকৃত রীতি, সেখানে আরো দু'রকম বিবাহের প্রকারভেদ দেখা যেত—

(ক) **অনুলোম বিবাহ (Hypergamy) ঃ** উচ্চবর্ণের পুরুষের সঙ্গে নিম্ন বর্ণের নারীর বিবাহকে বলা হয় অনুলোম বিবাহ। এ ধরনের বিবাহ সমাজে বৈধতা লাভ করত।

(খ) **প্রতিলোম বিবাহ (Hipogamy) ঃ** নিম্নবর্ণের পুরুষের সঙ্গে উচ্চবর্ণের নারীর বিবাহকে বলা হয় প্রতিলোম বিবাহ। এ ধরণের বিবাহ সমাজে কোন স্বীকৃতি লাভ করত না বা নীচ চোখে দেখা হত। এ ধরণের বিবাহ সমাজে এক প্রকার নিষিদ্ধ ছিল।

(২) বিবাহে পাত্র-পাত্রীর যোগ্যতা, গুণাগুণ প্রভৃতির সামঞ্জস্যের ভিত্তিতে বিবাহ দু'প্রকার ঃ

(ক) **সমসংস্থ বিবাহ (Homogamy) ঃ** এই প্রকার বিবাহে পুরুষ এবং নারীর বয়স, ধর্ম, জাতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা, সামাজিক মর্যাদা, অর্থনৈতিক অবস্থান প্রভৃতির বিচার করে মোটামুটি একই প্রকারের যোগ্যতা সম্পন্ন নর-নারীকে বিবাহের পাত্র-পাত্রী রূপে নির্বাচন করা হয়।

(খ) **অসমসংস্থ বিবাহ (Heterogamy) ঃ** এ ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে (সামাজিক মর্যাদা, অর্থনতিক অবস্থান, বয়স, ধর্ম, জাতি, শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রভৃতি) ব্যাপক অসাম্য দেখা যায়।

(৩) **পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের অধিকার বা কর্তৃত্বের ভিত্তিতে বিবাহ দু'প্রকার ঃ** আয়োজিত বিবাহ (Arranged Marriage) এবং রোম্যান্টিক বিবাহ (Romantic Marriage)। আয়োজিত বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন থেকে বিবাহ অনুষ্ঠান পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়াদিতে পরিবরের বয়োজ্যেষ্ঠদের মতামত প্রধান এবং পাত্র-পাত্রীর নিজস্ব ইচ্ছার গুরুত্ব গৌণ। এ ধরণের বিবাহ কৃষি-ভিত্তিক যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় বেশী দেখতে পাওয়া যায় এবং এর সঙ্গে ধর্মীয় বিষয়াদি যুক্ত থাকে।

অপরপক্ষে, রোম্যান্টিক বিবাহের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রী নিজেরাই তাদের সঙ্গী নির্বাচন করে এবং সেখানে পরিবারের অন্যান্যদের ভূমিকা ও গুরুত্ব নগন্য। এটি শিল্পভিত্তিক নগরকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থায় অধিক প্রচলিত।

(৪) **লেভীরেট এবং সরোরেট (Levirate and Sororate) ঃ** কোন স্ত্রীর স্বামী মারা যাওয়ার পর, স্বামীর পরিবারের বিবাহযোগ্য কোন পুরুষ (মৃত স্বামীর ভাই বা দাদা) দ্বারা উক্ত বিধবাকে স্ত্রী রূপে গ্রহণের বিধিকে বলে লেভীরেট।

অপরপক্ষে, স্ত্রীর মৃত্যুর পর মৃতা স্ত্রীর পরিবারের বিবাহ যোগ্যা কোন কন্যাকে (স্ত্রীর বোন) পত্নী হিসাবে গ্রহণের বিধিকে বলা হয় সরোরেট। উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় বিবাহের সময় কোন কন্যাপণ দিতে হয় না। প্রথম বিবাহের ক্ষেত্রে দেওয়া কন্যাপণের বিনিময়ে স্বামীর পরিবার যাতে একজন নারীর উৎপাদন এবং প্রজনন ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ রূপে ব্যবহার করে সমৃদ্ধ হতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই দু'ধরণের বিবাহ রীতিকে সমাজ বৈধতা দান করে।

বিবাহের গুরুত্ব ঃ

প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি ব্যক্তি জীবন এবং সমাজজীবনে প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

(১) বিবাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজে নর-নারীর যৌন সম্পর্ক একটি সুস্থ ও সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করে, যার মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক বিকাশ সাবলীলভাবে ঘটে। যৌন ব্যাভিচার ও বিশৃঙ্খলার আশঙ্কাকে দূর করে সামাজিক সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করে বিবাহ ব্যবস্থা। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের যৌন চাহিদাকে সুসংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ উপায়ে পরিতৃপ্তি দান করার উদ্দেশ্যে রচিত সামাজিক বিধি ব্যবস্থাই হল বিবাহ ব্যবস্থা। সুতরাং প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহ ব্যবস্থা সামাজিক নিয়ন্ত্রণেও সাহায্য করে।

(২) বিবাহের মাধ্যমে বৈধ, স্বীকৃত পরিবার সৃষ্টি হয়, যা সমাজের ক্ষুদ্রতম একক।

(৩) বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য পরিবার সৃষ্টির মাধ্যমে সন্তান প্রজনন করা এবং জাতককে সামাজিক বৈধতা দান করা। বিবাহ ব্যবস্থা বংশগতির ধারা অব্যাহত রাখতে এবং বংশগতি নির্ধারণে সহায়ক।

(৪) সন্তানের লালন-পালন এবং সামাজীকীকরণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পিতা-মাতার স্থায়ী সংগঠন এবং পিতা-মাতা সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট আত্মীয়গণের সংগঠন— যা বিবাহ দ্বারা স্থিরীকৃত হয়।

(৫) অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিবাহ গুরুত্বপূর্ণ। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগীতার সম্পর্ক তৈরী হয়। তাছাড়া, বিবাহ পরিবারের মধ্যে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের পথ সুগম করে।

(৬) বিবাহ শুধুমাত্র নর-নারীর মিলন নয়, এটি দু'টি ভিন্ন পরিবার, দু'টি ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে মিলন। বিবাহের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে বিবিধ আত্মীয়তা সম্পর্ক (অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান) যা বিভিন্ন ব্যক্তির মর্যাদা, দায়-দায়িত্ব, কর্তব্য নির্দিষ্ট করে এবং ব্যাপক অর্থে বৃহত্তর সামাজিক সংহতি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে।

(৭) বিভিন্ন সমাজে বিবাহ ব্যবস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মীয় আচার আচরণ এবং রীতি-নীতি যুক্ত থাকে। বিভিন্ন ধর্মে স্বামী-স্ত্রীর একত্র ধর্মাচরণের বিধি লক্ষ্য করা যায়। সুতরাং বিবাহ সমাজে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক যুক্ত।

বিবাহ, পরিবার এবং আত্মীয় ব্যবস্থা ঃ

বিবাহ এবং পরিবার দু'টিই বিশ্বজনীন ব্যবস্থা এবং যে কোন সমাজব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ। বিবাহ প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরিবার হল সমাজের ক্ষুদ্রতম একক। বৈধ যৌন সম্পর্ক এবং বৈধ সন্তান প্রজননের বিষয়ে বিবাহ এবং পরিবার ব্যবস্থা পরস্পর সংযুক্ত। বিবাহ দ্বারা সৃষ্ট পরিবার সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান হিসাবে কেবলমাত্র যৌন আকাঙ্খার সুস্থ এবং স্থায়ী পরিতৃপ্তি সাধন এবং বৈধ সন্তান উৎপাদনের কার্য সম্পাদন করে না, সন্তান প্রতিপালন, সামাজিকীকরণ, সদস্যদের দৈহিক-মানসিক নিরাপত্তা প্রদান, সামাজিক পরিচয় এবং মর্যাদা নির্দিষ্ট করণ, অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান, শিক্ষামূলক ভূমিকা গ্রহণ, ধর্মশিক্ষা দান, সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নির্বাচন, সমাজ ও সংস্কৃতির ধারণ ও সংরক্ষণে পরিবারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অধ্যাপক বার্জেস এবং লক তাই পরিবারের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে

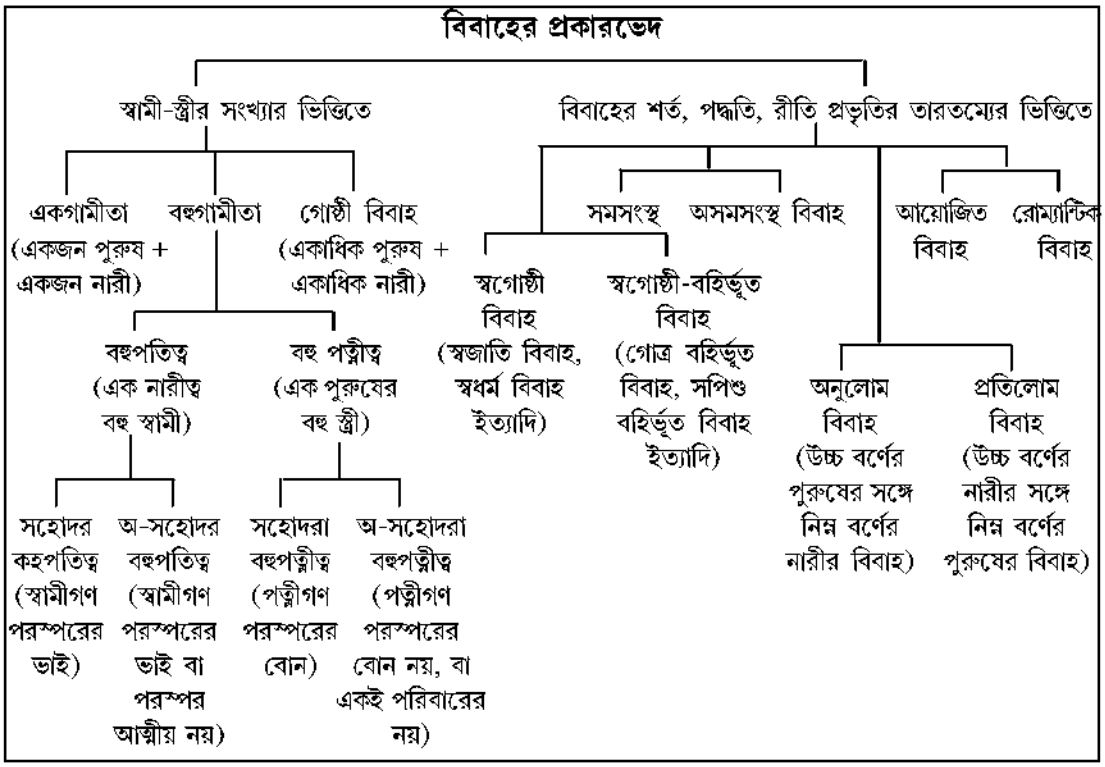

ছকের মাধ্যমে সংক্ষেপিত বিবাহের বিভিন্ন রূপভেদ

গিয়ে বলেছেন, পরিবার হল বিবাহ, রক্ত-সম্পর্ক বা দত্তক সূত্রে আবদ্ধ গোষ্ঠী যারা অভিন্ন বাসগৃহে বসবাস করে; যারা স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা, ভাই-বোন প্রভৃতি যথাযোগ্য সামাজিক ভূমিকানুযায়ী পরস্পরের সাথে আন্তঃক্রিয়া ও সংযোগ সম্পর্কে সামিল হয়ে এক অভিন্ন সংস্কৃতি গড়ে তোলে।

সমাজে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান আত্মীয়তা-বন্ধন (Kinship)। বিবাহ একটি নবজাতককে বৈধতা দান করে এবং তার বংশ পরিচয় নির্দিষ্ট করতে সাহায্য করে। এই বংশধারা (Descent) বিষয়টি মূলতঃ দুই প্রজন্মের জৈবিক সম্পর্কের সামাজিক স্বীকৃতি। প্রত্যেক সমাজে বংশধারা নির্ণয়ের সুনির্দিষ্ট রীতি প্রচলিত আছে। ফলতঃ প্রত্যেক ব্যক্তি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার পরিবার এবং পরিবার বহিভূত বহু ব্যক্তির সঙ্গে বিশেষ বৈধ সম্বন্ধ জালে জড়িত হয়ে পড়ে। এই সম্বন্ধ-জালের অন্তর্গত ব্যক্তিদের সঙ্গে তার ব্যবহারের ধরণ, অধিকার, কর্তব্য, দায়-দায়িত্ব, আচরণ এবং উক্ত বিষয়গুলির প্রতিদানের ধরণ সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত থাকে। বংশধারার সঠিক নির্ধারণ দ্বারা আইন বা সুপ্রতিষ্ঠিত প্রথার সাহায্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারণ ও হস্তান্তরিতকরণ সম্ভব হয়। সমাজজীবনে আত্মীয়তা বন্ধন প্রধানতঃ দু'প্রকারে গড়ে ওঠে ঃ (১) বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং (২) রক্ত সম্পর্কের (কাল্পনিক [যথা ঃ গোত্র] এবং বাস্তব) ভিত্তিতে (বিবাহ প্রতিষ্ঠান দ্বারা রক্ত-সম্পর্ক সামাজিক বৈধতা লাভ করে)।

পরিবারের বিভিন্ন প্রকারভেদ, বৈশিষ্ট্য এবং উক্ত বিভিন্ন প্রকার পরিবারে বিভিন্ন আত্মীয় গোষ্ঠীর

গুরুত্বের তারতম্য প্রভৃতি সংক্ষেপে একটি ছাত্রের সাহায্যে পরপৃষ্ঠায় বর্ণনা করা হল, যা একনজরে বিবাহ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরিবার ও আত্মীয়তা-বন্ধনের নিবিড় আন্তঃসম্পর্কটি অনুধাবনে সহায়ক হবে।

বিভাজনের ভিত্তি	পরিবারের প্রকার ভেদ	বৈশিষ্ট্য	গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয় গোষ্ঠী
১. বিবাহ ব্যবস্থা	একগামী	একজন পুরুষের একজন বৈধ স্ত্রী	
	বহুগামী	একজন পুরুষের একাধিক বৈধ স্ত্রী বা একজন নারী একাধিক বৈধ স্বামী	
	বহু পত্নীক	এক পুরুষের একাধিক বৈধ স্ত্রী।	
	বহু পতিত্ব	এক নরীর একাধিক বৈধ স্বামী	
২. বিবাহ পরবর্তী আবাসস্থল	পিতৃ আবাসিক	স্বামী হবে নবদম্পতির বসবাস	স্বামীর পিতৃ বংশানুক্রমিক আত্মীয় কুল অধিক গুরুত্বপূর্ণ
	মাতৃ আবাসিক	স্ত্রীর মাতৃগৃহে স্বামী-স্ত্রীর বসবাস	স্ত্রীর মাতৃবংশীয় আত্মীয়গণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ
	স্বয়ম্ আবাসিক	তৃতীয়/নতুন কোন আবাস গঠন	স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বংশধারার আত্মীয়গণ সমগুরুত্বপূর্ণ।
	উভয় স্থানিক	স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের বাড়ীতে বসবাস	উভয় দিককার আত্মীয়গণ সম গুরুত্বপূর্ণ।
	মাতৃ-পিতৃ স্থানিক	প্রথমে স্ত্রীর বাড়ীতে এবং পরে স্বামীর গৃহে বসবাস	
	মাতুলালয় বাসস্থানিক	স্বামীর মাতুলালয়-এর নিকট বসবাস	মাতৃকূল সংক্রান্ত আত্মীয়গণ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
৩. বংশানুক্রম	মাতৃ বংশানুক্রমিক	জাতকের পরিচয় মাতৃকূল অনুসারী	মাতৃকূলের আত্মীয়গণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ
	পিতৃ বংশানুক্রমিক	জাতকের পরিচয় পিতৃকূলানুসারী	পিতৃকূলের আত্মীয়গণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
৪. কর্তৃত্ব	মাতৃতান্ত্রিক	বয়োজ্যেষ্ঠা নারী বা বাতা পরিবারের কর্তৃ	মাতৃবংশীয় আত্মীয়গণ অধিক গুরুত্বপূর্ণ।
	পিতৃতান্ত্রিক	বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ বা পিতা পরিবারের কর্তা	পিতৃবংশীয় আত্মীয়গণ অধিক গুরুত্বপূর্ণক্র
৫. সম্পর্কের প্রকৃতি	রক্ত সম্পর্ক ভিত্তিক	সদস্যদের মধ্যে বাস্তব বা কাল্পনিক রক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান	
	বিবাহ সম্পর্ক ভিত্তিক	সদস্যদের মধ্যে বৈধ যৌন সম্পর্ক বিদ্যমান	
৬. কাঠামো	একক পরিবার	এক দম্পতি এবং অবিবাহিত সন্তান সন্ততি নিয়ে গঠিত	
	যৌথ পরিবার	একাধিক দম্পতি, একাধিক প্রজন্ম ও তাদের বিবাহিত-অবিবাহিত সন্তান-সন্ততিদের নিয়ে গঠিত পরিবার যে	

বিভাজনের ভিত্তি	পরিবারের প্রকার ভেদ	বৈশিষ্ট্য	গুরুত্বপূর্ণ আত্মীয় গোষ্ঠী
		পরিবারে ব্যক্তি জন্মায় এবং তার লালনপালন ঘটে।	
৭. ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের নিরিখে	পালয়িতৃ পরিবার প্রজননার্থ পরিবার	যে পরিবারে ব্যক্তি জন্মায় এবং তার লালন পালন ঘটে। বিবাহের পর গঠিত পরিবার, যেখানে ব্যক্তি সন্তান উৎপাদন করে।	

অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান (Economic Institution) ঃ সমাজস্থ মানুষ বেঁচে থাকার স্বার্থে তার পার্থিব প্রয়োজন পূরণের জন্য যে সকল কার্যপ্রণালী বা পদ্ধতিকে আশ্রয় করে সম্পদ উৎপাদন, বণ্টন এবং ভোগ করে থাকে, সেগুলিকে একত্রে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান বলা হয়। মানব সমাজের জন্মলগ্ন থেকেই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি। মানুষ ক্ষুধা নিবৃত্তির তাড়নায় প্রাকৃতিক সম্পদকে কেন্দ্র করে যা কিছু করে, তা সবই অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমাজে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলে, যার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক মানব সমাজের বিকাশ সূচিত হয়।

আদিম মানব সমাজে পশু শিকার এবং ফল হল জাতীয় খাদ্য সংগ্রহ- এই ছিল অর্থনৈতিক কার্যক্রম। ক্রমে মানুষ বন্যপশুকে বশ করে পশুপালনকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্তভূক্ত করেছে। ক্রমে কৃষিকাজ আয়ত্তে আসার পর কৃষিই হয়েছে সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল কার্যক্রম। পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে শিল্প সমাজ, যেখানে বড় বড় কলকারখানায় যন্ত্রের সাহায্যে প্রচুর পরিমাণে ভোগ্যপণ্য উৎপাদিত হয় এবং বাজার অর্থনীতির মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য প্রয়োজনানুসারে সমাজের বিভিন্ন অংশে বণ্টিত ও ভোগ্য হয়ে ওঠে।

অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং তৎসম্পর্কিত আচার-আচরণ সামাজিক আচরণের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফলতঃ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের আলোচনা ব্যতিরেকে সমাজ সম্পর্কিত আলোচনা অসম্পূর্ণ। তাই সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনায় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত ধারণা বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। দার্শনিক কার্ল মার্কস অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমাজের 'ভিত' বলে ব্যাখ্যা করেচেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করেই সমাজের অন্যান্য অংশ অর্থাৎ রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৈতিক, শিক্ষামূলক, পারিবারিক, আইন সংক্রান্ত বিবিধ প্রতিষ্ঠান সমাজে নির্দিষ্ট রূপে গড়ে ওঠে এবং সমাজব্যবস্থার উপরিকাঠামোটি গঠন করে। এমিল দুর্খাইমের শ্রমবিভাজন তত্ত্ব, ম্যাক্স ওয়েবারের প্রোটেস্ট্যাট ধর্মনীতি এবং ধনতন্ত্রের চেতনা সংক্রান্ত তত্ত্ব, প্যারেটো রচিত ভ্রমরের চক্রাকারে আবর্তন তত্ত্ব প্রভৃতিতে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা ও ব্যাখ্যা উপস্থিত।

সম্পত্তি (Property) ঃ ধারণা, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সমূহ

সমাজের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল সম্পত্তি। প্রয়োজনীয় বস্তুগত দ্রব্যের সঞ্চয় এবং সঞ্চিত বস্তুর প্রতি অধিকার—এই দুই বিষয়ের সূত্রেই সম্পত্তির ধারণাটির উদ্ভব ঘটে। 'সম্পত্তি' ধারণাটি দু'টি অর্থে প্রকাশিত ঃ প্রথমতঃ, ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মালিকানাধীন দ্রব্য বা বিষয়বস্তু হল সম্পত্তি।

এই দ্রব্য বা বিষয়বস্তু স্পর্শসাধ্য (Tangible) হতে পারে বা অদৃশ্য এবং স্পর্শসাধ্য নাও হতে পারে (Intangible)। জমি, বাড়ী, গহনা, বাসনপত্র, যন্ত্রাদি, অস্ত্রশস্ত্র প্রভৃতি স্পর্শসাধ্য (Tangible) সম্পত্তি। অপর পক্ষে, গ্রন্থস্বত্ত্ব (copy right), ব্যবসার সুনাম (good will) প্রভৃতি অ-স্পর্শসাধ্য সম্পত্তি।

দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে, সম্পত্তি বলতে কোন দ্রব্য বা বিষয়বস্তুকে বোঝায় না। ঐ সমস্ত দ্রব্য বা বিষয়বস্তুকে ব্যবহার করার অধিকারকেই বলা হয় সম্পত্তি।

ম্যাক আইভার এবং পেজের মতানুসারে, সম্পত্তি বলতে সম্পদ বা দখলীকৃত বিষয়বস্তুকে বোঝায় না; বরং স্থাবর অস্থাবর, দেহধারী বা বিদেহী (corporeal or incorporeal) সমস্ত প্রকার সম্পদকে নিয়ন্ত্রণ, শোষণ, ব্যবহার এবং ভোগ করতে পারার অধিকারকেই বলা হয় সম্পত্তি।

হবহাউস সম্পত্তিকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে কোন বিষয়বস্তুর উপর মানুষের স্থায়ী চূড়ান্ত এবং সমাজস্বীকৃত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার কথা বলেছেন।

মরিস জিনস্‌বার্গের সংজ্ঞানুযায়ী, সম্পত্তি বলতে একগুচ্ছ অধিকার এং দায়িত্ব-কর্তব্যকে বোঝায় যা বস্তুগত সম্পদ এবং বস্তুর ন্যায় বিবেচিত ব্যক্তিবর্গের উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার ভিত্তিতে ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্কের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। মানুষের সঞ্চয় প্রবৃত্তি থেকেই সম্পত্তির ধারণার উদ্ভব। যে সমস্ত বস্তু বা বিষয়বস্তু পৃথিবীতে চাহিদার তুলনায় কম থাকে, তাদেরই সঞ্চয় করা হয় এবং এই সমস্ত সঞ্চিত দ্রব্য এবং সঞ্চিত সামগ্রীর উপর একচেটিয়া মালিকানার অধিকারই হল সম্পত্তি।

প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) হস্তান্তর যোগ্যতা ঃ সম্পত্তি এক মালিক থেকে অন্য মালিকে হস্তান্তরিত হয়ে থাকে। উত্তরাধিকার সূত্রে, ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময়, উপহার প্রদান প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে সম্পত্তির হস্তান্তর সম্ভব।

(২) সম্পত্তির মালিকানা, ভোগদখল এবং নিয়ন্ত্রণ ঃ আইন অনুসারে কোন সম্পত্তির মালিক ও সেই সম্পত্তির ভোগদখলকারীর মধ্যে পার্থক্য থাকে। মালিক তার সম্পত্তিকে শর্তের বিনিময়ে অন্যের ভোগের বিষয় করে তুলতে পারেন। আবার, মালিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও সম্পত্তি অন্য ভোগদখলকারীর আয়ত্তে চলে যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ, কোন এক ব্যক্তি প্রভূত জমির মালিক হতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ জমি যে সব চাষী বর্গা নেন, অর্থাৎ বর্গাদাররা ঐ জমি প্রত্যক্ষভাবে ব্যবহার এবং ভোগদখল করতে পারেন। আবার সম্পত্তির মালিক এবং নিয়ন্ত্রক যে সর্বদা একই ব্যক্তি হবেন, এমন নাও হতে পারে। বৃহৎ শিল্প সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে মালিকানা থাকে এক বা একাধিক ব্যক্তির হাতে, আবার উক্ত সম্পত্তি পরিচালনার ও তার কাজকর্মের নিয়ন্ত্রক হয়ে থাকেন ম্যানেজার, ডাইরেক্টর প্রভৃতি পদাধিকারীগণ।

(৩) অধিকারের আপেক্ষিকতা ঃ সম্পত্তির অধিকার বিষয়টি কখনো চরম বা চূড়ান্ত হয় না। কোন সমাজই সম্পত্তিতে অনিয়ন্ত্রিত অধিকার মঞ্জুর করে না। সম্পত্তির অধিকারী মাত্রেই সেই সম্পত্তিকে পারিপার্শ্বিকতা উপেক্ষা করে যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারে না। উদা ঃ ঘনবসতি পূর্ণ শহরাঞ্চলে একখণ্ড জমির মালিকানা থাকলেও সেই জমিতে ইচ্ছামতন পটারি কারখানা, মদ প্রস্তুতির কারখানা ইত্যাদি গড়ে

তোলা যায় না। সরকারি প্রয়োজনে নির্দিষ্ট ক্ষতিপূরণের বিনিময়ে সম্পত্তির অধিকার ছেড়ে দেওয়ার বিষয়টিও সম্পত্তির উপর অধিকারের আপেক্ষিকতাকে প্রকাশ করে। সম্পত্তি ভোগ করার অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে থাকে নানা দায়িত্ব কর্তব্য। ফলতঃ কোন ব্যক্তি অন্যের ক্ষতিসাধন করে নিজ সম্পত্তি ভোগ করতে পারেন না। ব্যক্তি নিম্ন সম্পত্তির উপর তাঁর অধিকার এমনভাবে ভোগ করতে পারেন, যাতে অন্য ব্যক্তি বা সমষ্টির স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে।

(৪) সম্পত্তি ও অপ্রাচুর্য ঃ যে সমস্ত দ্রব্য বা বিষয়াদি পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে উপস্থিত তা সঞ্চয় করার জন্য তাড়না তৈরী হয় না। সুতরাং যা পৃথিবীতে পর্যাপ্ত পরিমাণে নেই বা যে সমস্ত বিষয়বস্তুর জন্য পৃথিবীতে অভাববোধ তৈরী হতে পারে, তাকে কেন্দ্র করে সম্পত্তির ধারণা গড়ে ওঠে।

(৫) সামাজিক স্বীকৃতি বা বৈধতা ঃ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কোন নির্দিষ্ট সম্পত্তির প্রতি অধিকার সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত হতে হয়। সমাজভেদে প্রথা বা আইন দ্বারা এই বৈধতা প্রাপ্তি ঘটে।

(৬) সম্পত্তির স্পর্শসাধ্যতা এবং অ-স্পর্শসাধ্যতা (Tangibility and Intangibility) ঃ সম্পত্তি বস্তুগত বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বা দৃশ্যমান হতে পারে (উদাঃ জমি, বাড়ী, পালিত পশু, গহনা ইত্যাদি)। আবার সম্পত্তি অন্তর্গত বা অদৃশ্য হওয়াও সম্ভব (যথা ঃ গ্রন্থস্বত্ত্ব [Copyright], সুনাম [Good will] প্রভৃতি)।

(৭) সম্পত্তি ও কর্তৃত্ব ঃ সাধারণভাবে সমাজে অন্যের উপর কর্তৃত্ব জারি রাখার ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। সাধারণতঃ দেখা যায়, যে ব্যক্তির সম্পত্তি যত বেশী তার সামাজিক মর্যাদা, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং প্রভুত্ব ক্ষমতাও তত বেশী হয়। তবে সমাজে এর বিপরীত ঘটনাও ঘটে থাকে। শিক্ষা, পদাধিকার এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত গুণাবলী অনেক সময় সম্পত্তির থেকে বেশী গুরুত্ব লাভ করে।

(৮) সম্পত্তির ধারণা ও মূল্যমান সীমিত ও পরিবর্তনশীল ঃ সম্পত্তি বিষয়টি যেহেতু এর উপযোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই স্থান-কালের ভেদে এর মূল্যমান পরিবর্তিত হয়।

(৯) সম্পত্তি গতিশীল ঃ জীবনযাত্রার গতিশীলতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মানব জীবনে উপযোগী হয়ে ওঠার জন্য সম্পত্তির বৈচিত্র্য সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে। মানুষ তার প্রয়োজন অনুসারে সময়োচিত ভাবে সম্পত্তিকে নানান ভাবে ব্যবহার করে জীবন ধারণের উপযোগী করে তোলে।

সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগ ঃ

সম্পত্তির শ্রেণীবিভাগের ক্ষেত্রে তিনটি মূল বিষয় বিবেচিত হয় ঃ

(ক) সম্পত্তির মালিকের সংখ্যা

(খ) মালিকের অধিকারের প্রকৃতি

(গ) সম্পত্তির বৈশিষ্ট্য

মালিকের সংখ্যা বা কার উপর সম্পত্তির অধিকার ন্যস্ত আছে, তার উপর ভিত্তি করে সম্পত্তি প্রধানতঃ চার ধরণের ঃ

১. **ব্যক্তিগত সম্পত্তি ঃ** যে সমস্ত বিষয়বস্তুতে ব্যক্তিগত ভোগ ও স্বত্ব স্বীকৃত এবং ব্যক্তি স্বেচ্ছায় (সমাজ নির্দিষ্ট প্রথা এবং রাষ্ট্রের আইন মেনে) যা ক্রয়-বিক্রয়-দান করতে পারে। তাকে ব্যকিক্তগত সম্পত্তি বলা হয়।

সমাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপস্থিতি কিছু সুবিধা দান করে। যথা—

- সম্পত্তির উপর মানুষের সহজাত অধিকার এবং ভোগ-দখলের ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করে।
- ব্যক্তিগত সম্পত্তি লাভের আশায় প্রতিযোগীতায় সামিল হওয়ার জন্য মানুষ নিজ নিজ দক্ষতা বৃদ্ধি করে, যা সমাজকে উন্নততর হয়ে উঠতে সাহায্য করে।
- সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা কাঠামো সুদৃঢ় হয়ে ওঠে।

অপরপক্ষে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপস্থিতি সমাজে কিছু অসুবিধা সৃষ্টি করে—

- সামাজিক অসাম্য সৃষ্টি করে।
- ব্যক্তির লোভ-লালসা বৃদ্ধি, হিংসা বৃদ্ধি, অস্বচ্ছতা, শঠতা প্রভৃতি মানবিক এবং নৈতিক গুণাবলীর পরিপন্থী বিষয়াদিকে উৎসাহিত করে।

২. **গোষ্ঠীগত বা সমষ্টিগত সম্পত্তি ঃ** বিশেষ কোন গোষ্ঠী বা সমষ্টির অধিকারভুক্ত সম্পত্তিকে বলে গোষ্ঠীগত সম্পত্তি। এ জাতীয় সম্পত্তি কোন ব্যক্তির নামে নথিভুক্ত থাকে না। বরং তা কোন সংগঠন, কোম্পানি, সংস্থা বা সমিতির নামে থাকে। **উদাহরণ ঃ** ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি, দেবত্র সম্পত্তি, যৌথ কারবার-সংগঠনের সম্পত্তি ইত্যাদি।

৩. **জনসাধারণের সম্পত্তি বা এজমালি সম্পত্তি ঃ** এই সম্পত্তিতে সমাজের সকলের সমান অধিকার থাকে এবং সকলেই এই সম্পত্তি সমানভাবে যথাযথ উদ্দেশে ভোগ করার অধিকার লাভ করে। উদাঃ রাস্তাঘাট, পার্ক, নলকূপ ইত্যাদি যা সাধারণভাবে জাতীয় সম্পত্তি বা 'জনসাধারণের জন্য উৎসর্গীকৃত' সম্পত্তি।

৪. **সরকারি সম্পত্তি ঃ** যে সকল বস্তু বা বিষয়াদি সরকারি অর্থে নির্মিত, অধিগৃহীত বা সরকারি প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়, যার উপর জনসাধারণের প্রত্যক্ষ অধিকার বা কর্তৃত্ব থাকে না; আবার যা কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের অধিকারভুক্ত নয়; কেবলমাত্র সরকারি নিয়মাবলী মেনে জনসাধারণ যে সম্পত্তির ব্যবহার করতে পারে; সরকারি পদাধিকার বলে অনেকসময় যে সম্পত্তিকে সরকারি স্বার্থ ও নিয়মানুসারে ব্যবহার করা যায়; সেই ধরণের সম্পত্তিকে বলে সরকারি সম্পত্তি। উদাঃ সরকার নির্মিত সেতু, বাসভবন, অট্টালিকা, উৎপাদন ক্ষেত্র ইত্যাদি।

উপরোক্ত চার ধরণের সম্পত্তি ছাড়াও আরো এক ধরণের সম্পত্তি বর্তমান। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে অবস্থিত সমুদ্রাঞ্চল, আকাশ, জমি এবং মহাকাশ এরূপ সম্পত্তির অন্তর্গত। এই সম্পত্তিকে আন্তর্জাতিক সম্পত্তি বলা হয়।

শ্রমবিভাজন (Division of Labour) ঃ

শ্রমবিভাজন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আর্থসামাজিক প্রতিষ্ঠান। মানুষ তার জীবনের নানাবিধ চাহিদা পূরণের জন্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর যা প্রয়োগ করে প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে নিজ প্রয়োজনীয় ব্যবহার্য দ্রব্য উৎপাদন করে তা হল শ্রম। জীবনের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ একক মানুষের শ্রম দ্বারা সহজসাধ্য নয়। তাই সমাজে মানুষ নানাবিধ চাহিদা পূরণের জন্য শ্রমসাধ্য কার্যগুলিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। সকলের মিলিত ব্যয়িত শ্রম প্রত্যেকের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করে। সাধারণ অর্থে এই ব্যবস্থারই নাম শ্রমবিভাজন। ফলতঃ শ্রমবিভাজন সমাজে পারস্পরিক সংযোগ ও নির্ভরশীলতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সামাজিক ঐক্যকে সুসংহত ও সুদৃঢ় করে।

শ্রমবিভাজন একটি সার্বজনীন প্রতিষ্ঠান। গোষ্ঠী জীবনে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত কার্যাবলী ছোট ছোট অংশে ভাগ করে, গোষ্ঠীর বিভিন্ন একককে নির্দিষ্টভাবে তাকে একটির দায়িত্বভার অর্পণ এবং প্রতিটি একক দ্বারা সেই নির্দিষ্ট অংশের কার্য সম্পাদনের ফলে সুষ্ঠ্য এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে বেঁচে থাকবার জন্য প্রয়োজনীয় সকল কার্যের পরিপূর্ণ সম্পাদন—এই হল শ্রমবিভাজনের মূল নীতি। এমিল দুর্খাইম তাঁর শ্রমবিভাজন সংক্রান্ত তত্ত্বে বলেছেন, আদিম সমসত্ত্ব সমাজে যেখানে সমাজে সমস্ত মানুষ একই ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল, সেখানে শ্রমবিভাজন গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। কারণ সমস্ত মানুষ সবধরণের কা করতে পারত। সমাজের আয়তন বৃদ্ধি, জনঘনত্ব বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শ্রমবিভাজন প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। আদিম সমাজে লিঙ্গভিত্তিক এবং বয়সভিত্তিক সাধারণ সরল প্রকৃতির শ্রমবিভাজনের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তীকালে পেশাগত বা বৃত্তিগত শ্রমবিভাজনের সৃষ্টি হয় (**উদাহরণ ঃ** কৃষক, পশুপালক, কামার, কুমোর ইত্যাদি)। তারপরে আসে জটিলতর শ্রমবিভাজন যা শিল্প সমাজের পরিচয়বাহী। এখানে একটি উৎপাদনকার্য বিভিন্ন অসম্পূর্ণ অংশে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি অংশে কার্য সম্পাদনের জন্য আলাদা আলাদা ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শ্রম নিয়োজিত হয়। আধুনিক শিল্পসমাজে শ্রমবিভাজন শ্রমের বিশেষীকরণে পরিণতি লাভ করেছে। বিশেষীকরণের সাধারণ অর্থ হল বিশেষ (অংশের) কাজের জন্য বিশেষ ব্যক্তির (পুনঃ পুনঃ) শ্রম প্রদান। একই ধরণের কাজ ক্রমাগত করার ফলে ঐ নির্দিষ্ট কাজের ক্ষেত্রে উক্ত শ্রমদানকারীর বিশেষ দক্ষতা গড়ে ওঠে। অপরপক্ষে, এক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিই সম্পূর্ণ কোন একটি কার্য সম্পাদনের দক্ষতা অর্জন করতে পারেন না। শ্রমদানকারী কোন উৎপাদনের সম্পূর্ণ অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকেন না। ফলে পরিপূর্ণ সৃষ্টির আনন্দ থেকে শ্রমদানকারী বঞ্চিত হন।

শ্রমবিভাজনের প্রভাব ঃ

শ্রমবিভাজন আধুনিক শিল্প সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। সমাজে শ্রমবিভাজনের সুফল এবং কুফল উভয়ই প্রতিভাত হয়।

সুবিধা ঃ

১. শ্রমবিভাজনের ফলে উৎপাদনের সমগ্র কার্যধারাটি বিভিন্ন ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকে। ফলে কোন

ব্যক্তি সমগ্র কার্যধারা সম্পর্কে অবগত বা দক্ষ না হলেও নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী নির্দিষ্ট অংশের কার্যধারায় শ্রমপ্রদান করতে পারে। সুতরাং শ্রমবিভাজন ব্যক্তিকে তার উপযুক্ত কাজটি খুঁজে নিতে সাহায্য করে। পুনঃ পুনঃ একই কাজ করর ফলে ঐ বিশেষ অংশের কাজ সম্পর্কে ব্যক্তি বিশেষ দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়। ঐ বিশেষ অংশ সম্পর্কে তার ভাবনা-চিন্তা, গবেষণার সুযোগ থাকে।

২. শ্রমবিভাজন উৎপাদন সময়ের হ্রাস ঘটাতে সাহায্য করে। ফলে নির্দিষ্ট সময়ে শ্রমদানের ফলে অনেক বেশী পরিমাণ উৎপাদন এবং সরবরাহ সম্ভব হয়।

৩. শ্রমবিভাজন একটি নির্দিষ্ট দ্রব্যের উৎপাদনকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে এবং প্রতিটি অংশের ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা ব্যক্তি নিয়োজিত হয়। ফলে প্রতিটি অংশের গুণমান যাচাই, এবং উৎকর্ষ বৃদ্ধির সুযোগ থাকে। ফলে বিভিন্ন অংশের মিলনে উৎপন্ন সম্পূর্ণ দ্রব্যটির গুণমান বৃদ্ধি পায়।

৪. শ্রমবিভাজন এবং শ্রমের বিশেষীকরণের ফলে একজন ব্যক্তি একটি নির্দিষ্ট ধরণের কাজে বিশেষ রূপে পারদর্শী এবং দ হয়ে ওঠে। ফলে, এক কারখানা থেকে অন্য কারখানায় তার কাজের সুযোগ করে নিতে পারে। ফলে সমাজে অনুভূমিক সচলতা বৃদ্ধি পায়।

৫. শ্রমবিভজন উৎপাদনের পরিমাণ এবং সরবরাহের বৃদ্ধি ঘটানোর ফলে, দ্রব্যের মূল্যমান হ্রাস পায়। সমাজে ব্যক্তির ক্রয় সামর্থ্য বৃদ্ধি পায়। ফলে জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটে।

৬. শ্রমবিভাজনের ফলে ব্যক্তি উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট অংশের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ফলে সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে তার জ্ঞান এবং সমগ্র উৎপাদন ব্যবস্থাকে ঘিরে তার শ্রমদান-এর প্রয়োজন হয় না। ফলে ব্যক্তির উপর মানসিক এবং শারীরিক চাপ হ্রাস পায়।

৭. শ্রমবিভাজন বিশেষ অংশের কাজের জন্য বিশেষ উৎকর্ষতা সম্পন্ন যন্ত্রাদির আবিষ্কার ও ব্যবহারকে উৎসাহিত করে।

৮. শ্রমবিভাজন সমাজে বিভিন্ন ধরণের কাজ এবং পেশার সৃষ্টি করে।

৯. একটি নির্দিষ্ট অংশের কাজে বারংবার অংশগ্রহণ করায় কাজটি কোন ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয়। ফলে উক্ত কাজে ক্রমশ ঐ ব্যক্তির সময় এবং শ্রম কম লাগে। ফলে সময় এবং শ্রমের অপচয় রোধে শ্রমবিভাজন সহায়তা করে।

অসুবিধা ঃ

১. শ্রমবিভাজনের ফলে এক ব্যক্তি দীর্ঘদিন যাবৎ একই কাজ করতে বাধ্য হয়। তার কাজে বৈচিত্র্য থাকে না। এরফলে কর্মে একঘেয়েমি সৃষ্টি হয়।

২. শ্রমবিভাজন একজন কর্মীকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট অংশে সীমাবদ্ধ রাখে। অন্য অংশগুলি সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান বা দক্ষতা তৈরী হয় না। বারংবার একই কাজ করে যাওয়ায় তার বুদ্ধিবৃত্তির হ্রাস ঘটে এবং তার নিজস্ব উন্নতির পথ রুদ্ধ হয়ে যায়।

৩. খণ্ডিত কার্যের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সম্পূর্ণ উৎপাদন কার্যপ্রণালী সম্পর্কে কর্মীদের কোন দায়বদ্ধতা

তৈরী হয় না। পূর্ণ দ্রব্য উৎপাদনের সন্তুষ্টি থেকে কর্মী বঞ্চিত হয়। উৎপাদিত দ্রব্যের গুণমান সম্পর্কে তার নিজস্ব গর্ববোধ তৈরী হয় না।

৪. শ্রমবিভাজন সমগ্র উৎপাদন প্রক্রিয়াকে খণ্ডিত অংশগুলির কার্য সম্পাদনের উপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল করে তোলে। ফলে কোন একটি অংশে কোন ক্ষতি ঘটলে, অন্যান্য অংশে তার প্রভাব পড়ে এবং সামগ্রিকভাবে উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৫. শ্রমবিভাজন কারখানাগুলিতে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কিন্তু বণ্টন বা বিপনন সেই বর্ধিত হারে না ঘটলে কোম্পানি Over-production (অতিরিক্ত উৎপাদন)-জনিত সমস্যার সম্মুখীন হয়।

৬. দ্রব্যের গুণগত মান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন সময় হ্রাস-এর উদ্দেশ্যে উন্নততর যন্ত্রের ব্যবহার বহু কর্মীকে কর্মহীনতা বা বেকারত্বের দিকে ঠেলে দেয়।

৭. কর্ম হারানো শ্রমিকের উৎপাদনের অন্যান্য অংশে জ্ঞান বা দক্ষতা না থাকায় অন্যান্য কারখানায় তার উপযুক্ত কার্যলাভ কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে।

৮. শ্রমবিভাজন বৃহদায়তন শিল্পক্ষেত্রে বহু শ্রমিকের নিয়োগ অবশ্যম্ভাবী করে। বহু শ্রমিকের উপস্থিতি এবং শ্রমের সুলভ যোগান প্রকারান্তরে শ্রমিকের প্রতি বঞ্চনার সুযোগ তৈরী করে দেয়। কর্মক্ষেত্রে খণ্ডিত অংশে কর্মরত হওয়ার জন্য শ্রমিক ঐক্য বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে শ্রমিকস্বার্থ বিঘ্নিত হয়। শিল্পক্ষেত্রে বহুবিধ শ্রমিক সমস্যা, যেমন—শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক বিক্ষোভ, ধর্মঘট প্রভৃতির সৃষ্টি হয়।

রাজনৈতি প্রতিষ্ঠান (Political Institution) ঃ

মানুষের সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের উদ্দেশ্য হল সুস্থ, নিরাপদ, সুন্দর জীবনযাত্রাকে সুনিশ্চিত করে তোলা। সুতরাং, সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের জীবনধারা অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ হতে পারে না। নিয়মতান্ত্রিক সামাজিক জীবনকে সম্ভব করে তোলার জন্য সমাজে সুষ্ঠ শাসনব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ, প্রশাসনিক ক্ষমতার প্রয়োগ ও বণ্টন প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে সমাজ জীবনে সৃষ্ট হয় কতকগুলি নির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী। এই কার্যপ্রণালীগুলিকে বলা হয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে ক্ষমতার ব্যবহার, বণ্টন এবং সামগ্রিক নিয়ন্ত্রণ কায়েম করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। আবার নির্দিষ্ট সমাজ (গোষ্ঠী, দেশ, রাষ্ট্র, রাজ্য প্রভৃতি)-এর নিরাপত্তা রক্ষা এবং আভ্যন্তরীন আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার মত গুরুতর কার্য সমাধা হয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।

সাধারণ ভাবে, রাজনৈতিক সম্পর্ক বলতে বোঝায় শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক। সমাজে যে কোন দু'জন ব্যক্তির সম্পর্ককে বলা যায় রাজনৈতিক সম্পর্ক কারণ ক্ষুদ্রতম এককের কোন সম্পর্কেও একজন ব্যক্তির অপরকে নিয়ন্ত্রণ করার, নিজের মত অন্যের উপর চাপিয়ে দেওয়ার বা নিজ ইচ্ছানুসারে অন্যকে চালিত করার প্রবণতা বা ঘটনা বাস্তব সত্য। ক্ষেত্রবিশেষে দু'জন ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্যে নিয়ন্ত্রক এবং নিয়ন্ত্রিতর অবস্থানের রদ বদল হতে পারে মাত্র। সুতরাং, রাজনৈতিক সম্পর্ক সামাজিক সম্পর্কের অন্যতম বাস্তব দিক। রাজনীতি বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আলোচনার শুরুতেই দু'টি বিশেষ ধারণা 'ক্ষমতা' ও 'কর্তৃত্ব'-এর ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

ক্ষমতা (Power) ঃ যা প্রয়োগ করে কোন ব্যক্তি তার নিজস্ব ইচ্ছা বা মতামত অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের উপর (তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা ব্যতিরেকে) বলপূর্বক বা অন্য কোন উপায়ে চাপিয়ে দিতে পারে, অপরকে নিজ ইচ্ছানুসারে চালিত করতে পারে, তাকে বলে ক্ষমতা।

কর্তৃত্ব (Authority) ঃ ক্ষমতা বৈধতা প্রাপ্ত হলে তা কর্তৃত্বে রূপান্তরিত হয়।

সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবারের তত্ত্ব অনুসারে, ক্ষমতা বৈধতা প্রাপ্ত হয় তিনটি উপায়ে ঃ

১. ঐতিহ্যের অনুমোদন দ্বারা বৈধতা প্রাপ্ত ক্ষমতাকে বলা হয় ঐতিহ্যবাহী কর্তৃত্ব (Traditional Authority)। উদাঃ— রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রের সিংহাসনে বসার অধিকার।

২. ব্যক্তি মানুষের অসামান্য গুণাবলী, গণমোহিনী গুণ ক্ষমতাকে বৈধতা দান করলে তা পরিণত হয় ঐন্দ্রজালিক বা গণমোহিনী কর্তৃত্বে (Charismatic Authority)। উদাঃ— লেনিন, মহাত্মাগান্ধী, মাও-সে-তুং, প্রমুখ নেতার কর্তৃত্ব।

৩. যুক্তিসিদ্ধ আইনসম্মত ভিত্তিতে বৈধতা প্রাপ্ত ক্ষমতাকে বলে আইনগত ও যুক্তিসঙ্গত কর্তৃত্ব (Rational legal Authority)। উদাঃ— বর্তমান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা।

ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ধারণার ভিত্তিতে সমাজে কার্যকরী হয় বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সমাজে দু'টি বৃহৎ ও বিশিষ্ট রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হল রাষ্ট্র এবং সরকার। আধুনিক বিয়ে কেবলমাত্র অভিজ্ঞ, যোগ্য এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের দ্বারাই রাষ্ট্রীয় ও সরকারি ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন হওয়া সম্ভব। সেই কারণে সকল রাষ্ট্রেই সরকারি ক্ষেত্রে 'আমলা' নামে পরিচিত সুসংগঠিত এক প্রশাসক গোষ্ঠীর অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়। রাষ্ট্র ও সরকারি ব্যবস্থায় অন্য যে সব প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে তারা হল রাজনৈতিক দল (Political Party), স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest group) এবং চাপ-সৃষ্টিকারী দল (Pressure group)।

রাষ্ট্র (State) ঃ

রাষ্ট্র হল সমাজের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংগঠন এবং কার্যপ্রণালী যা সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ ও সুনির্দিষ্ট রূপদান এবং মানুষের নানাবিধ প্রয়োজন ও চাহিদা মেটানোর জন্য সৃষ্ট অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সংঘ ও প্রতিষ্ঠান সমূহের কাজকর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান ও তাদের কর্মপন্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের মতে, পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে যখন কয়েকটি গ্রাম ও পরিবার একত্রিত হয়, তখন তাকে বলে রাষ্ট্র।

রোমান দার্শনিক সিসেরো বলেছেন, রাষ্ট্র হল বিপুল সংখ্যক মানুষ নিয়ে গঠিত একটি সমাজ যার সদস্যগণ সাধারণ অধিকারবোধ এবং পারস্পরিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ হন। বার্জেসের মতে, রাষ্ট্র হল নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে রাজনৈতিক ভাবে সংগঠিত জনসমষ্টি।

অধ্যাপক ম্যাক আইভারের অভিমত অনুসারে, রাষ্ট্র হল একটি সংস্থা যা সরকার প্রণীত আইনের

মাধ্যমে নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের একত্রিত সমাজের সামাজিক শৃঙ্খলার বাহ্যিক এবং সার্বজনীন অবস্থানটি বজায় রাখে।

অধ্যাপক গার্ণার প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও শাসনতান্ত্রিক আইনের একটি ধারণা হিসাবে রাষ্ট্র হল, নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী বহু অল্পসংখ্যক লোক নিয়ে গঠিত একটি জনসমাজ, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বা প্রায় সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থেকে একটি সুসংগঠিত সরকার গঠন করে, যার প্রতি অধিকাংশ অধিবাসী আনুগত্য প্রদর্শন করে।

রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য ঃ

১. **জনসমষ্টি ঃ** জনসমষ্টি হল রাষ্ট্রের এক অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু রাষ্ট্রের জনসংখ্যা বিষয়ে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা নেই। রাষ্ট্রের অধীন জনসমষ্টিকে নাগরিক বলা হয়।

২. **নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ঃ** জনসমষ্টি একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বসাস না করলে রাষ্ট্র তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। রাষ্ট্রের ভূখণ্ড বলতে নির্দিষ্ট সীমারেখার অন্তবর্তী ভূ-ভাগ, নদ-নদী, পর্বত, ভূগর্ভস্থ সম্পদ, উপকূলভাগ, সমুদ্রের জলভাগ এবং আকাশপথকে বোঝায়। কিন্তু নির্দিষ্ট রাষ্ট্রের উপকূল থেকে সামুদ্রিক জলভাগের কতদূর পর্যন্ত রাষ্ট্রের সীমানা হতে পারে এ বিষয়ে মতদ্বৈধ আছে। একইভাবে ভূ-খণ্ডের উপর অবস্থিত আকাশ-সীমা নিয়েও মতানৈক্য আছে।

৩. **সরকার ঃ** সরকার হল রাষ্ট্রের একটি মাধ্যম বা যন্ত্র যা দ্বারা রাষ্ট্র তার ইচ্ছা এবং কার্যকারিতাকে বাস্তবায়িত করে। সরকারের তিনটি বিভাগ আইন বিভাগ, শাসন বিভাগ এবং বিচার বিভাগ। তবে সংকীর্ণ অর্থে সরকার বলতে এর শাসনবিভাগকে বোঝানো হয়ে থাকে।

রাষ্ট্রের সরকার বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে সরকার প্রধানতঃ দু'প্রকার---এককেন্দ্রিক (Unitary) ও যুক্তরাষ্ট্রীয় (Federal)। শাসক বা পরিচালকের সংখ্যর ভিত্তিতে সরকার প্রধানতঃ তিন প্রকার—রাজতন্ত্র (Monarchy), অভিজাততন্ত্র (Aristocracy) এবং গণতন্ত্র (Polity and Democracy)। রাজনৈতিক মতাদর্শের ভিত্তিতে বহুজন শাসিত সরকার প্রধানতঃ দু'প্রকারের হতে পারে—বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সরকার (Bourgeousie Democracy) এবং সমাজতান্ত্রিক সরকার (Socialist Government/ Socialist Democracy)।

৪. **সার্বভৌমত্ব ঃ** সার্বভৌমত্ব অর্থাৎ চূড়ান্ত কর্তৃত্ব, যা রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে আইনের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। সার্বভৌমত্ব দু'প্রকারের---আভ্যন্তরীন এবং বাহ্যিক। রাষ্ট্র তার নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে সকল ব্যক্তি, সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং সরকারের ওপর তার চরম ক্ষমতা প্রকাশের অধিকারী রাষ্ট্রের এই কর্তৃত্ব হল আভ্যন্তরীন কর্তৃত্ব। বাহ্যিক সার্বভৌমত্ব বলতে বোঝায়--- রাষ্ট্র বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ বা প্রায় সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। বর্তমানে রাষ্ট্র এ দু'প্রকারের সার্বভৌমত্বের অধিকারি হলেও আভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র তার জনসমষ্টির মতামত, প্রচলিত প্রথা, ধ্যানারণা প্রভৃতিকে যেমন অস্বীকার করতে পারে না, তেমনি বাহ্যিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সমূহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক নির্ভরশীলতার কারণে অন্যের অনুরোধ-আদেশ,

আন্তর্জাতিক আইন-চুক্তি-সন্ধি, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নীতি-নির্দেশ প্রভৃতির দ্বারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত হয়।

৫. **স্থায়িত্ব** ঃ রাষ্ট্র হঠাৎ করে গঠিত বা বিলুপ্ত হতে পারে না, তাকে স্থায়ী হতে হয়।

৬. **কূটনৈতিক স্বীকৃতি** ঃ একটি রাষ্ট্র গঠিত হতে গেলে অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতির প্রয়োজন। বর্তমানে এটি রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য্য বৈশিষ্ট্য। পৃথিবীর সকল রাষ্ট্র এ স্বীকৃতি না দিলেও অন্তত কিছু কিছু প্রধান রাষ্ট্রসমূহের স্বীকৃতি এ ক্ষেত্রে আবশ্যক।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy) ঃ

আমলাতন্ত্রের ইংরাজী প্রতিশব্দ Bureaucracy শব্দটি ফরাসী শব্দ 'Bureau' অর্থাৎ ডেস্ক বা টেবিল এবং গ্রীক শব্দ Kratein অর্থাৎ শাসন-এর সমাহারে গঠিত। অর্থাৎ ব্যুৎপত্তিগত অর্থে আমলাতন্ত্রের অর্থ 'টেবিল-শাসনব্যবস্থা'। অনেক সময় এক-একটি দপ্তর অর্থেও Bureau শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। এদিক থেকে আমলাতন্ত্র বলতে বিভিন্ন দপ্তরের মাধ্যমে শাসন পরিচালনাকে বোঝায়।

ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর *Essays on sociology* শীর্ষক গ্রন্থে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন 'আমলাতন্ত্র হল এমন এক শাসন ব্যবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হল দক্ষতা (expartness), নিরপেক্ষতা (impartiality) এবং মানবতার অনুপস্থিতি (absence of humanity)। তাঁর মতে বর্তমান শিল্প সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল আমলাতান্ত্রিক পরিচালনা পদ্ধতি। রবার্ট মিচেলস্-এর মতানুসারে, আমলাতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে বৃহদায়তন-বিশিষ্ট সংগঠন পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে।

সাম্প্রতিককালে বৃহদায়তন-বিশিষ্ট সকল সংগঠনের সুষ্ঠ পরিচালনার স্বার্থে আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে অপরিহার্য বিবেচনা করা হয়। সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রকার বৃহদায়তন সংগঠন, সে শিল্প-বাণিজ্য, শিক্ষা বা ধর্ম যে সম্পর্কিত সংগঠনই হোক না কেন, তার মধ্যে আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য এবং অস্তিত্ব বর্তমান।

আমলাতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমূহ ঃ

মাক্স ওয়েবার (*Essays on Sociology*) এবং লা-পেয়ার (*Sociology*) আমলাতন্ত্রের গঠন বৈশিষ্ট্য, দায়িত্ব-কর্তব্য দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন প্রভৃতি প্রসঙ্গে যা আলোচনা করেছেন, তা থেকে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য সমূহকে আমলাতন্ত্রের মৌলিক বৈশিষ্ট্য রূপে চিহ্নিত করা যায়—

(ক) ঊর্দ্ব-অধঃ শ্রেণীবিন্যাস (hierarchy) ঃ ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, পদ এবং মর্যাদার ভিত্তিতে এই শ্রেণীবিন্যাস করা হয়ে থাকে। ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রন সর্বদা বর্তমান থাকে

(খ) অনমনীয়তা ঃ আমলাতান্ত্রিক সংগঠনের বিভিন্ন বিভাগ ও উপ-বিভাগের মধ্যে শ্রমবিভাগের নীতি প্রযুক্ত হয়। তাই আমলাতান্ত্রিক কাঠামো অনমনীয় প্রকৃতির হয়। একটি বিভাগ বা উপ-বিভাগের কোন অংশের কর্মচারীর পক্ষে অন্য কোন বিভাগ বা অংশের কাজে হস্তক্ষেপের সুযোগ থাকে না।

(গ) যোগ্যতার বিচারে এবং নির্দিষ্ট চুক্তির ভিত্তিতে কর্মী নিয়োগ ঃ সাধারণতঃ নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে আমলাদের নিযুক্ত করা হয়। তাঁদের বেতন, ভাতা, কার্যকাল, চাকরির মেয়াদ ইত্যাদি নির্দিষ্ট চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

(ঘ) দায়-দায়িত্ব এবং কর্তৃত্বের পরিধি সুনির্দিষ্ট ঃ আমলাতন্ত্রের সকল পদাধিকারীর দায়-দায়িত্ব, কর্তৃত্ব ও কার্যাবলীর পরিধি সুনির্দিষ্ট। এই কর্তৃত্ব কোন ব্যক্তির আয়ত্তাধীন নয়, পদের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। প্রতিটি পদাধিকারীর কর্তব্য ও কর্তৃত্বের মধ্যে কোন রকম সংশয় বা সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

(ঙ) শৃঙ্খলাপরায়ণতা এবং নিয়মানুবর্তিতা ঃ সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান দ্বারা আমলাতন্ত্র পরিচালিত হয়। নির্দিষ্ট রুটিনমাফিক পদ্ধতিতে আমলাতন্ত্রের কাজকর্ম পরিচালিত হয়। দীর্ঘকালীন সাংগঠনিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্ন বিভাগের কার্য পরিচালনা-সম্পর্কিত নিয়ম-নীতি নির্ধারিত হয়। প্রশাসনিক কাঠামোতে যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ, নিয়মকানুন সবই যথা সম্ভব লিখিত ভাবে থাকে। আমলাতান্ত্রিক শাসন পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা নজির এবং নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন দ্বারা পরিচালিত হয়। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে সাযুজ্য বজায় থাকে এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়। ফলে স্বজন পোষণ এবং স্বৈরাচারের পথ যথাসম্ভব বন্ধ হয়।

(চ) নৈর্ব্যক্তিকতা ঃ আমলাতান্ত্রিক কাঠামোতে পদাধিকারীর ব্যক্তিগত পরিচয় গুরুত্বহীন, পদটিই গুরুত্বপূর্ণ। ফলস্বরূপ আমলাতন্ত্রে আরোপিত মর্যাদার কোন গুরুত্ব নেই, মর্যাদা এক্ষেত্রে দক্ষতা এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে অর্জিত।

বিভিন্ন সমাজচিন্তক আমলাতন্ত্রের নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি চিহ্নিত করেছেন—(১) আমলাতন্ত্র ব্যক্তি স্বাধীনতার পক্ষে বিপজ্জনক, (২) আমলাতন্ত্র মানবিকতা বর্জিত যান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্ম দেয়, (৩) আমলাতন্ত্র রক্ষণশীলতার ধারক ও বাহক, (৪) বিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গী, জনজীবন থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং দীর্ঘসূত্রীতা আমলাতন্ত্রের অন্যতম বড় ত্রুটি।

রাজনৈতিক দল (Political Party) ঃ

অধ্যাপক নিউম্যানের মতে, "রাজনৈতিক দল হল রাজনৈতিকভাবে সচেতন মানব সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের এমন এক সক্রিয় সংগঠন যা স্বতন্ত্র মতাদর্শে বিশ্বাসী অপরাপর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে প্রতিযোগীতার ভিত্তিতে জনসমর্থন আদায়ের মাধ্যমে সরকারী ক্ষমতা অধিকারের চেষ্টা করে।"

প্রকৃত প্রস্তাবে, রাজনৈতিক দল হল এক বিশেষ সামাজিক গোষ্ঠী। সমাজের বৃহত্তর পরিধির মধ্যে রাজনৈতিক দল হল অর্থবহ ও নির্দিষ্ট ধারায় কার্যকলাপের এক বিশেষ ব্যবস্থা।

বৈশিষ্ট্য ঃ

(১) রাজনৈতিক দল গঠিত হয় অভিন্ন মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং ঐক্যবদ্ধ ও সংগঠিত ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে। রাজনৈতিক দলের সদস্যদের মধ্যে মতাদর্শগত ঐক্য বজায় থাকলেও দলের বিস্তারিত কার্যক্রম প্রসঙ্গে ভিন্ন মত থাকতেই পারে।

(২) রাজনৈতিক দলের নির্দিষ্ট কর্মসূচী থাকে। রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে প্রত্যেক রাজনৈতিক দল নিজ নিজ কর্মসূচীকে বাস্তবায়িত করার উদ্যোগ নেয়।

(৩) রাজনৈতিক দলের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল জনসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে সরকারি ক্ষমতা দখল করা এবং তৎসহ দলের উদ্দেশ্য ও আদর্শকে বাস্তবায়িত করা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ্যে গঠিত দল রাজনৈতিক দল বলে বিবেচিত হয় না।

(৪) রাজনৈতিক দল জাতীয় স্বার্থ দ্বার অনুপ্রণিত হয়।

(৫) দেশ এবং দেশবাসীর সমকালীন সমস্যা বিষয়ে অবিরত আলাপ আলোচনা এবং বিতর্কের মাধ্যমে রাজনৈতিক দল নিজ মতাদর্শের অনুকূলে জনমত গঠনের চেষ্টা করে।

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Gruop) ঃ

চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যরা সমভাবাপন্ন এবং অভিন্ন স্বার্থ দ্বারা আবদ্ধ। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সরকারের নীতি নিধারণের বিষয়টিকে প্রভাবিত করতে এবং নিজেদের অনুকূলে আনতে উদ্যোগী হয়। সরকারি ক্ষমতা দখল চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মূল উদ্দেশ্য নয়।

অধ্যাপক অ্যালান আর বল তাঁর *Modern Politics and Government* শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন, যে গোষ্ঠীর সদস্যরা অংশীদারী মনোভাবের দ্বারা আবদ্ধ থাকে তাকে চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলে। তাঁর মতে, চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী একপ্রকার বৃহৎ বর্গনাম হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বিভিন্ন 'স্বার্থগোষ্ঠী' (Interest Group) এবং 'মনোবৃত্তিবাহী গোষ্ঠী' (Attitude Group) এর অন্তভুক্ত। বলের মতে, অভিন্ন উদ্দেশ্যগত বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষীতে যে গোষ্ঠীর সদস্যদের অংশীদারী মনোভাব গড়ে ওঠে তাকে 'স্বার্থগোষ্ঠী' বলে। উদাহরণ হিসাবে একই পেশার ব্যক্তিদের নিয়ে গড়ে ওঠা স্বার্থগোষ্ঠীসমূহ যেমন—কৃষক সংগঠন, শিক্ষক সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, শ্রমিক সংগঠন ইত্যাদির কথা বলা যায়। স্বার্থগোষ্ঠীগুলি চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে সরকারি সিদ্ধান্ত ও নীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তবে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করার মধ্যেই স্বার্থগোষ্ঠীর কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকে না। অন্যান্য বহু ও বিবিধ লক্ষ্যে এর কার্যকলাপ পরিচালিত হয়।

অপর দিকে 'মনোবৃত্তিবাহী গোষ্ঠী'র সদস্যরা কতকগুলি ক্ষেত্রে সমমূল্যবোধে বিশ্বাসী। এঁরা নির্দিষ্ট এবং অভিন্ন মূল্যবোধের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হন। পেশাগত অভিন্নতার প্রয়োজন এক্ষেত্রে হয় না। **উদাহরণ ঃ** পশুক্লেশ নিবারণ সমিতি, পরিবেশ-দূষণ রোধ দমিতি ইত্যাদি। এ ধরণের গোষ্ঠীর উদ্দেশ হল নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে সরকারি সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করা।

ধর্ম (Religion) ঃ

মানব সমাজের সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে সম্পর্কযুক্ত। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজকে চিহ্নিত করা যায় নি যেখানে কোন রকম ধর্ম-বিশ্বাস বা ধর্মীয় সংস্থা নেই। মানবজীবনে, ব্যক্তির চিন্তাধারা, আদর্শ, কাজকর্ম প্রভৃতির সঙ্গে ধর্ম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং, ধর্মের একটি ব্যক্তিগত দিক যেমন আছে, তেমনি আছে এক সামাজিক দিক।

ধর্মের ইংরাজী প্রতিশব্দ 'religion' এর উৎপত্তি 'religare' শব্দ থেকে যার অর্থ বন্ধন। এই বন্ধন মানুষের সঙ্গে মানুষের হতে পারে, আবার মানুষের সঙ্গে উচ্চতর কোন সত্তা বা ঐশ্বরিক শক্তির বন্ধনও হতে পারে। সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু থেকে 'ধর্ম' শব্দটির উৎপত্তি। 'ধৃ' শব্দের অর্থ ধারণ করা। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে বিচার করলে ধর্ম হল এমন এক বিষয় বা কর্মপ্রণালী যা ব্যক্তি এবং সমাজকে ধারণ করে; ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির বন্ধন, সমাজ ও ব্যক্তির বন্ধন, সমাজ-ব্যক্তি-উচ্চতর সত্ত্বার বন্ধনকে সূচিত করে।

সংজ্ঞা ঃ

অধ্যাপক জেমস্ ফ্রেজার তাঁর *The Golden Bough* শীর্ষক গ্রন্থে ধর্মের ধারণাটি ব্যাখ্যা ও আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন, "ধর্ম হল, মানুষের চেয়ে উন্নততর বিভিন্ন শক্তি যা প্রকৃতির ধারা ও মানবজীবনের গতিপথ নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ করে বলে বিশ্বাস করা হয়, তাদের প্রসন্নতা বা সন্তুষ্টি সাধন।"

ম্যাক আইভার ও পেজের মতে, 'ধর্ম শব্দটি দ্বারা আমরা বুঝি, শুধুমাত্র মানুষের সাতে মানুষের সম্বন্ধকেই নয়, মানুষের সঙ্গে তার চেয়ে উচ্চতর কোন শক্তির সম্পর্ককেও।'

অগবার্ন ও নিমকফের মতানুসারে, ধর্ম হল অতিমানবিক শক্তির প্রতি মানুষের মনোভাব। এমিল দুর্খাইমেই মতে, সকল ধর্ম বিশ্ব পৃথিবীর যাবতীয় কিছুকে দু'টি ভাগে ভাগ করে---পবিত্র (Sacred) এবং অপবিত্র (Prafane)। নিত্য নৈমিত্তিক জীবন ধারণের জন্য মানুষ যা কিছু করে তা Profane-এর অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র বস্তু সকল ভয়-ভীতি-শ্রদ্ধার এলাকায় অবস্থান করে যা দৈনন্দিন জীবন থেকে আলাদা ভাবে রাখা হয়। এই পবিত্র বস্তু বা বিষয়াদিকে কেন্দ্র করে মানুষের বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা, রীতি, আচারাদি, অনুষ্ঠান, কার্যকলাপ প্রভৃতি এবং এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের নিয়ন্ত্রক একটি বৃহত্তর সংস্থা যা একই পবিত্র বিষয়াদিতে বিশ্বাসী ব্যক্তি সমষ্টিকে একত্রিত করে—এই সমস্ত-এর মিলিত রূপই হল ধর্ম।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১. ধর্ম হল অলৌকিক, অপার্থিব, অতিপ্রাকৃত, অতিমানবিক, উচ্চতর এবং অদৃশ্য সত্তার প্রতি মানুষের বিশ্বাস এবং সম্পর্ক।

২. ধর্মের দু'টি দিক বর্তমান---অন্তরঙ্গ দিক এবং বহিবঙ্গ দিক। উচ্চতর অদৃশ্য সত্তার প্রতি ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রভৃতি মানসিক আবেগ এবং অনুভূতি হল ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক। উক্ত সত্তাকে ঘিরে পূজা-অর্চনা, অনুষ্ঠান, রীতি-আচার ইত্যাদি কার্যকলাপ হল ধর্মের বহিরঙ্গ।

৩. ধর্মের সঙ্গে পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ধারণা সংযুক্ত।

৪. ধর্ম যেমন উচ্চতর অতিপ্রাকৃত সত্তার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টা, তেমনি একই পবিত্র বস্তু বা বিষয়াদিতে বিশ্বাসী এবং একই রীতি আচার পালনকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যেও ঐক্য সম্পর্ক স্থাপনের কার্যক্রম।

ধর্মের উপাদান সমূহ (Components) ঃ

১. ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মমত (Theology and Creeds) এবং ধর্মগ্রন্থ ঃ প্রত্যেক ধর্মের নিজস্ব ধ্যানধারণা,

আদর্শ, ঈশ্বর সম্পর্কিত এবং ঈশ্বর লাভের উপায় সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রভৃতি থাকে, যা দ্বারা মানুষের ধর্মবোধ জাগ্রত করা হয় এবং মানুষকে নির্দিষ্ট ধর্মমতাবলম্বী করে তোলা হয়। এগুলিকে বলা হয় ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মমত। উদাঃ মুসলমানদের কোরান, খ্রীষ্টানদের বাইবেল, হিন্দুদের বেদ— উপনিষদ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে উক্ত ধর্মের মূল তত্ত্ব ও মত সমূহ লিপিবদ্ধ আছে।

২. **প্রতীক (Symbol)** ঃ প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব প্রতীক বা চিহ্ন আছে যা উক্ত ধর্মের প্রতিনিধি স্বরূপ। যথা ঃ খ্রীষ্টানদের ক্রশ, ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের অর্ধচন্দ্র, হিন্দু ধর্মের স্বস্তিক চিহ্ন প্রভৃতি।

৩. **ধর্মীয় বিধি (Religious Codes)** ঃ প্রতিটি ধর্মেরই কিছু নিয়ম-কানুন, বিধি-নিষেধ থাকে যা উক্ত ধর্মাবলম্বীদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ধর্মীয় বিধিসমূহকে ঈশ্বর নির্দিষ্ট মনে করা হয় এবং এই বিধিসমূহ অলঙ্ঘনীয়। এর সঙ্গে পাপ-পুণ্যের ধারণাযুক্ত থাকে। **উদাহরণ** ঃ বৌদ্ধদের অষ্টাঙ্গিক মার্গ, মুসলিমদের শরিয়ত, হিন্দুদের মনুসংহিতা, খ্রীষ্টানদের Ten Commandments প্রভৃতি উক্ত ধর্মসমূহের বিভিন্ন বিধি।

৪. **উৎসব অনুষ্ঠান (Feslivals and ceremony)** ঃ ইহা ধর্মের বহিরঙ্গ দিক। বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান সমবেতভাবে পালনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সন্তুষ্টি সাধনের লক্ষ্যে এগুলি উদ্‌যাপিত হয়। উদাঃ হিন্দুদের দুর্গাপূজা, দীপাবলী উৎসব; মুসলিমদের ইদুজ্জোহা, ঈদলফেতর ইত্যাদি।

৫. **ধর্ম সম্প্রদায় (Sect)** ঃ একই ধর্মের অভ্যন্তরে সৃষ্টি হওয়া বিবিধ গোষ্ঠী যাদের ধর্ম এক হলেও মত ও পথ আলাদা। উদাঃ বৌদ্ধধর্মে হীনযান-মহাযান, হিন্দুধর্মে একেশ্বরবাদী সর্বেশ্বরবাদী ইত্যাদি।

৬. **পৌরানিক কথা (Myth)** ঃ প্রত্যেক ধর্মেই কিছু গল্পকথা বা গল্পগাথার সন্ধান পাওয়া যায় যাতে জীব রূপে আবিভূত ঈশ্বরে (অবতার) অলৌকিক কার্যকলাপ (লীলা) বর্ণিত থাকে। এগুলির মাধ্যমে সহজভাবে গল্পচ্ছলে সমাজস্থ মানুষকে ধর্মীয় উপদেশ, ধর্মতত্ত্ব, ধর্মমত এবং বিধি-নিষেধ সম্পর্কে শিক্ষাদান করা হয়।

৭. মোক্ষ (Salvation)-এর ধারণা ঃ পার্থিব সমস্ত সুখ শান্তি লাভের পাশাপাশি নশ্বরের সঙ্গে প্রকৃত মিলন ঘটিয়ে অনন্ত সুখলাভ হল মোক্ষ। মোক্ষলাভের জন্য সমস্ত ধর্মেই সঠিক উপায়ে ধর্মপালন এবং নানা আচার-বিধি পালনের নির্দেশ দেওয়া হয়।

সমাজে ধর্মের ভূমিকা ঃ

ধর্মের সামাজিক ভূমিকা ব্যাপক প্রকৃতির। ধর্ম মানুষের জীবন এবং আচার আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। ফলে, সমাজে ব্যক্তিবর্গের অবস্থান, সম্পর্ক এবং আচরণ ধর্ম দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। সমাজ জীবনে ধর্মের প্রভাব দু'প্রকার হতে পারে ঃ ইতিবাচক ও নেতিবাচক।

ইতিবাচক ভূমিকা ঃ

১. ব্যক্তি মানুষের আচার-আচরণ এবং সমাজ-জীবনের ধারা ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ধর্ম সমাজস্থ মানুষকে নীতিনিষ্ঠ করে তোলে। দুর্খাইমের মতে, ধর্মীয় অনুশাসন বা

বিধি-নিষেধগুলি প্রকৃতপক্ষে ঐশ্বরিক নির্দেশের মোড়কে সমাজের নিয়ম-নীতি-প্রথা লোকাচার এবং অনুশাসনগুলিকেই দৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে ধর্ম সামাজিকীকরণ এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে কার্যকরী হয়।

২. ধর্ম একই ধরণের পবিত্র বিষয়াদিতে বিশ্বাস, একই আচার-বিধি পালন, একই উৎসবে সমবেত যোগদান, সমবেত পূজার্চনা, প্রার্থনা প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজস্থ মানুষকে সমবেতভাবে একই কার্যপ্রণালীতে নিয়েজিত করে। ফলে মানুষের মধ্যে একতাবোধ ও সংহতি দৃঢ় হয়।

৩. ব্যক্তি মানুষের ব্যক্তিত্বের উপর ধর্মবিশ্বাস কার্যকরী প্রভাব বিস্তার করে। ব্যক্তির জীবনদর্শন, জীবনবোধ অনেকাংশে ধর্ম দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। অতীন্দ্রিয় দৈব শক্তিতে বিশ্বাস এবং ধর্মীয় নীতিতে আস্থা মানুষকে বহু বিপর্যয়েও কোথাও একটা নিরাপত্তা বা সান্তনাদানে সমর্থ হয়। মানুষের মনে আশ ও বিশ্বাস যোগায়।

৪. সমাজবদ্ধ মানুষের সংস্কৃতি ও বস্তুজগৎ ধর্ম দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। সমাজের সদস্যদের বাস্তব জীবনে ধর্মীয় নীতিবোধের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজতাত্ত্বিক ম্যাক্স ওয়েবার তাঁর *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism* গ্রন্থে বিশদে আলোচনা করেছেন কি ভাবে ধর্মীয় নীতিবোধের বিভিন্নতা বিভিন্ন সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার রূপান্তরকে প্রভাবিত করে।

৫. যথার্থ ধর্মবোধ ব্যক্তি-মানুষকে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগে অনুপ্রাণিত করে। ধর্মাচরণের প্রেক্ষিতে সমাজজীবনে বহু জনকল্যানকর ও সমাজসেবামূলক কার্যকলাপ ঘটে ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত উদ্যোগে। এগুলি পরোক্ষে সমাজজীবনের উন্নতিতে সহায়তা করে।

৬. ধর্মীয় উদ্যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে সঙ্গীত-সাহিত্য-চিত্রকলা ভাস্কর্য-স্থাপত্য প্রভৃতি ললিত কলা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন ঘটেছে। উদাহরণস্বরূপ মন্দির-মসজিদ-চার্চ প্রভৃতির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্য, ধর্মমূলক চিত্রকলা, ধর্মীয় সাহিত্য ইত্যাদির উল্লেখ করা যায়।

নেতিবাচক ভূমিকা ঃ

১. ধর্মীয় প্রভাব মানুষকে অদৃষ্টবাদী ও কল্পনাবিলাসী করে তোলে। অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে এবং ভবিষ্যৎ স্বর্গসুখের কল্পনা বিলাসে মানুষ বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা-বঞ্চনা-শোষণ প্রভৃতি হতে মুক্তির উপায় নিজ উদ্যোগে না খুঁজে একপ্রকার বিভোর অবস্থায় দিন কাটায়। আত্মবিশ্বাস হারিয়ে দৈবনির্ভর হয়ে মানুষ নিরুদ্যম, নিস্পৃহ, ক্লীব জীবন যাপন করে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার শক্তি হারিয়ে, সে অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করে। তাই কার্ল মার্কস ধর্মকে 'আফিম'-এর সঙ্গে তুলনা করেছেন।

২. মার্কসের মতে, ধর্ম শ্রেণী-শোষণের হাতিয়ার বিশেষ। সমাজের কতিপয় স্বার্থন্বেষী শাসক শ্রেণী ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে জনগণের উপর শোষণ জারি রাখে। মার্কসের মতে, সমাজের বুনিয়াদ হল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা উপরিকাঠামোকে রূপদান করে। ধর্ম এই উপরিকাঠামোর অংশ মাত্র। সুতরাং, অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় উৎপাদন উপায়ের মালিকানা যাদের হাতে থাকে তারা নিজেদের স্বার্থে

ধর্মকে শোষণের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে। এবং মালিকানাহীন সাধারণ জনগণ যারা উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমদান করে তারা ধর্মবিশ্বাসে বিভোর থেকে এই শোষণকে দৈব বলে মেনে নেয় এবং ক্রমাগত বঞ্চনা-উৎপীড়ন-শোষণের শিকার হয়।

৩. ধর্ম অনেকসময় অন্ধ আবেগ, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের জন্ম দেয় যা বিজ্ঞান, সৃজনমুখী চিন্তাধারা ও কার্যপ্রক্রিয়ার পরিপন্থী। ইহা সমাজের অগ্রগতিকে রুদ্ধ করে।

৪. ধর্ম যেমন একদিকে সংযোগকারী সংহতিমূলক চেতনার জন্ম দেয়, অপরদিকে বিভেদমূলক শক্তির উৎস হিসাবেও কার্যকরী হয়ে ওঠে। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানব গোষ্ঠী সমূহ অনেক সময় পরস্পরের প্রতি অ-সহনশীল হয়ে ওঠে। ফলে হিংসাত্মক সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয়তঃ ব্যাপক অর্থে শিক্ষা বলতে বোঝায় ব্যক্তি আজীবন তার চলার পথে যে সকল অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার সমষ্টিকে। এই অভিজ্ঞতা সমষ্টি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটায়। এই শিক্ষা ব্যক্তিকে সমাজে অন্যান্যদের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে তার সম্পর্ককে বুঝতে সাহায্য করে। এই শিক্ষার কোন সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি বা পাঠক্রম থাকে না।

শিক্ষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য ঃ

১. আধুনিক শিক্ষা একটি নিরবচ্ছিন্ন, সচেতন ও ক্রমবিকাশমান প্রক্রিয়া।

২. শিক্ষা প্রথাসিদ্ধ বা আনুষ্ঠানিক (Formal) এবং প্রথাবহির্ভূত বা অনুষ্ঠানিকতা বিহীন (Informal) উভয় প্রকারেই পরিচালিত হতে পারে।

৩. একটি সচেতন প্রক্রিয়া এবং একটি বৌদ্ধিক কার্যক্রম হিসাবে শিক্ষার সর্বদা পূর্ব পরিকল্পিত লক্ষ্য থাকা আবশ্যক।

৪. প্রথাগত শিক্ষার মূল উপাদান সমূহ অর্থাৎ শিক্ষক, শিক্ষার্থী, পাঠক্রম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ প্রভৃতিকে সর্বদা নির্দিষ্ট ও পূর্বপরিকল্পিত লক্ষ্যাভিমুখে সক্রিয় ও সুসমন্বিত রাখা আবশ্যক।

৫. শিক্ষা একটি ধারাবাহিক চেষ্ঠিত প্রক্রিয়া। পূর্বপরিকল্পিত লক্ষ্য এই প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলে এবং এই লক্ষ্যের সাপেক্ষেই শিক্ষার অগ্রগতির পরিমাপ সম্ভব হয়।

৬. সমাজ যেহেতু একটি চলমান প্রক্রিয়া, সততঃ পরিবর্তনশীল সমাজে ব্যক্তিকে সামাজিক ও যোগ্য করে তোলার জন্য শিক্ষার প্রকৃতি এবং লক্ষ্যও পরিবর্তনশীল।

শিক্ষা (Education) ঃ অর্থ ও সংজ্ঞা

শিক্ষা বা Education শব্দটি ল্যাটিন শব্দ 'Educare' থেকে উদ্ভুত, যার অর্থ 'to bring up' বা প্রতিপালন করা। 'Educare' শব্দটি আবার Educate ক্রিয়াপদটির সঙ্গে সংযুক্ত, যার অর্থ 'to bring out' বা বিকশিত করা। সুতরাং, বুৎপত্তিগত অর্থে 'Education' বা শিক্ষার কাজ হল শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক গুণাবলীর বিকাশ ঘটিয়ে, তার ব্যক্তিত্বকে পূর্ণতা প্রদান করা। শিক্ষা ব্যক্তিকে সমাজ জীবনে যোগ্য হয়ে উঠতে সাহায্য করে। সামাজিকীকরণের একটি প্রধান মাধ্যম হল শিক্ষা।

বিভিন্ন দার্শনিক ও সমাজতাত্ত্বিকগণ শিক্ষার বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন। এমিল দুর্খাইমের মতানুসারে, শিক্ষা হল নব প্রজন্মের সামাজিকীকরণ। প্লেটের মতে, শিক্ষা হল শিক্ষার্থীর দেহ ও মনের সৌন্দর্য ও শক্তির বিকাশ সাধন।

জন ডিউই-এর মতে, শিক্ষা হল ব্যক্তিকে সামাজিক করে তোলার জন্য সামাজিক কর্মপ্রণালী।

ব্রাউন ও বউসেকের মতানুসারে, শিক্ষা হল সেইসকল অভিজ্ঞতার সমষ্টি যা শিশু এবং পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির বিশ্বাস এবং চিন্তাধারার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের আচার আচরণকে সুনির্দিষ্ট রূপ দান করে।

ম্যাকেঞ্জির মতানুসারে, শিক্ষা হল এমন একটি প্রক্রিয় যার দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত হয় এবং যার দ্বারা ব্যক্তিবর্গ অন্যদের সঙ্গে ও বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে নিজ সম্পর্ক অনুধাবনে সক্ষম হয়।

শিক্ষা দু'প্রকারের হতে পারে। প্রথমতঃ সঙ্কীর্ণ অর্থে শিক্ষা বলতে সচেতনভাবে গৃহীত, আনুষ্ঠানিক (Formal) শিক্ষাকে বোঝানো হয়। ম্যাকেঞ্জির মতে এ জাতীয় শিক্ষা হল মানুষের ক্ষমতার বিকাশ ও অনুশীলনের নিমিত্ত এক সচেতন প্রচেষ্টা। এর দ্বারা মানুষ সামাজিক হয়ে ওঠে এবং ব্যবহারিক জীবনে সাফল্যের সঙ্গে অগ্রসর হয়। সাধারণতঃ সমাজে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা-সংস্থাগুলি অর্থাৎ বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে এ জাতীয় শিক্ষাপ্রদান করা হয়। শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়োগ, সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম, পরীক্ষা ব্যবস্থা, মূল্যায়ন ও ফলপ্রকাশ, ডিগ্রী দান প্রভৃতি এ জাতীয় শিক্ষার অঙ্গ। সমাজস্থ ব্যক্তির যথাযথ বিকাশের জন্য শিক্ষা এই পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা সমূহের সমন্বয় সাধন ঘটতে সাহায্য করে।

শিক্ষার লক্ষ্য ঃ

বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্‌গণ শিক্ষার লক্ষ্য হিসাবে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। সংক্ষেপে শিক্ষার লক্ষ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—

১. আপাত বা সাময়িক লক্ষ্য (Proximate aim) ঃ শিক্ষার আপাত লক্ষ্য হল সম্পূর্ণভাবে সমাজে বসবাসের জীবনপ্রণালী আয়ত্ত করা। এই আপাত লক্ষ্য আবার তিন ভাগে বিভক্ত যথা ঃ

(ক) বৃত্তিমুখী লক্ষ্য (জীবীকা ও কর্মদক্ষতা অর্জনে সহায়তা করা)

(খ) কৃষ্টিমুখী লক্ষ্য (নবীন প্রজন্মের কাছে সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলি সংরক্ষণ ও সঞ্চলনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তরিত করা)

(গ) অভিযোজন মূলক লক্ষ্য (শিক্ষার্থীকে সমাজ জীবনের উপযোগী করে তোলা যাতে সে সার্থকভাবে সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা, লোকাচার প্রভৃতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে যথার্থ সামাজিক জীবে পরিণত হতে পারে।)

(২) দূরবর্তী বা চরম লক্ষ্য (Distant aim) ঃ বিভিন্ন শিক্ষাবিদ্ ও দার্শনিকগণ শিক্ষার চরম লক্ষ্য

বলতে শিক্ষার্থী তথা সমাজের সার্বিক বিকাশ-এর কথা বলেছেন। এই চরম লক্ষ্য নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয় ঃ

(ক) জ্ঞানার্জন বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ, (খ) আত্মোপলব্ধি, (গ) আধ্যাত্মিক চেতনার বিকাশ, (ঘ) নৈতিক চরিত্র গঠন, (ঙ) নান্দনিকতা বা সৌন্দর্যবোধের বিকাশ, (চ) সৃজনশীলতার বিকাশ, (ছ) দৈহিক ও মানসিক বিচ্যুতি নিয়ন্ত্রন ও সুসংযত করা।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শিক্ষার কার্যাবলী ঃ

১. সামাজিকীকরণের প্রথাসিদ্ধ মাধ্যম হিসাবে শিক্ষা শিক্ষার্থীকে সমাজের রীতি-নীতি লোকাচার, প্রথা, বিশ্বাস, আচার-আচরণ পদ্ধতি প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত করে এবং যথার্থ সামাজিক জীবে পরিণত করে।

২. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম হিসাবেও শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষা ব্যক্তিকে সুনির্দিষ্ট ও সুশৃঙ্খল আচার-আচরণ রপ্ত করায় এবং সমাজের নীতি আদর্শ-মূল্যবোধ প্রভৃতির আত্তীকরণ ঘটাতে সাহায্য করে। ফলে ব্যক্তি সমাজে অনভিপ্রেত, বিচ্যুতিমূলক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে দূরে থাকাকে রপ্ত করে ফেলে।

৩. শিক্ষা ব্যবহারিক জীবনে জীবিকা নির্বাহের জন্য শিক্ষার্থীকে যোগ্য করে তোলে।

৪. রাজনৈতিক শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করে, রাজনীতি সম্পর্কে আগ্রহী করে ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগায়। শিক্ষা ব্যক্তিকে তার রাজনৈতিক অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তাকে সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তোলে।

৫. ধর্মীয় শিক্ষা ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক বোধ জাগ্রত করে। ফলে সমাজে শৃঙ্খলা ও সংহতি বজায় থাকে।

৬. অধ্যাপক গিডিংসের মতে, শিক্ষা ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ ক্ষমতাকে জাগ্রত করে, কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা থেকে মুক্তি দান করে, জ্ঞানের বিকাশ ঘটায়, বাস্তবসম্মত চিন্তা করতে শেখায় এবং আলোকপ্রাপ্ত নাগরিক হয়ে উঠতে সাহায্য করে। সুনাগরিকের প্রধান কর্তব্য সামাজিক সংহতি বিধান। শিক্ষা সমাজস্থ মানুষকে সামাজিক ঐক্য বলবৎ রাখার প্রেরণা যোগায়।

তৃতীয় একক (Unit – III) ❐ সামাজিক প্রক্রিয়া (Social Process)

সামাজিক প্রক্রিয়া (social Process) ঃ

সামাজতত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল 'সামাজিক প্রক্রিয়া'। সমাজ হল বহুবিধ মানবিক সম্পর্কের জালিকা। একাধিক মানুষের মধ্যে নিরন্তর ঘটে চলা মিথস্ক্রিয়া বা আন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমেই এই সমস্ত সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সুতরাং, সামাজিক আন্তঃক্রিয়া হল সমাজের গতিশীল উপাদান এবং বহুবিধ আন্তঃক্রিয়াজাত সম্পর্কগুলি সমাজের অপরিহার্য উপাদান। সামাজিক সম্পর্ক দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ, পারস্পরিক দায়-দায়িত্ব পূরণ, পারস্পরিক মর্যাদাবোধ, পারস্পরিক উদ্দেশ্য পূরণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে সম্পন্ন হয়। সুতরাং, সামাজিক সম্পর্কগুলি এক একটি বিশেষ ধরণের মিথস্ক্রিয়াকে চিহ্নিত করে। এই বিশেষ ধরণের মিথস্ক্রিয়াগুলির পরস্পর সংঘবদ্ধ এবং নির্দিষ্ট ধারাবাহিকতায় শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপই হল সামাজিক প্রক্রিয়া।

সংজ্ঞা ঃ অধ্যাপক হর্টন এবং হান্টের মতে, সমাজ জীবনে লক্ষণীয় আচরণসমূহের পৌনপুনিকতাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলা হয়। অধ্যাপক জিনসবার্গ-এর মতে, সামাজিক প্রক্রিয়া বলতে সমাজে ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে ঘটমান মিথস্ক্রিয়া সমূহের বিবিধ ধরণ যথা সহযোগিতা এবং দ্বন্দ্ব, সামাজিক বিভাজন এবং সংহতি, উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং ধ্বংস প্রভৃতিকে বোঝানো হয়। অধ্যাপক এ. ডব্লু গ্রীণ-এর মতে, সমাজে মিথস্ক্রিয়াগুলিকে যে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে ঘটে, তাকে সামাজিক প্রক্রিয়া বলে।

সমাজে অগুনতি সমাজ নির্ধারিত সম্পর্ক বর্তমান এবং এই সম্পর্কগুলি উৎপন্ন হয় বিভিন্ন ধরণের সামাজিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। সামাজিক প্রক্রিয়াকে সাধারণভাবে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) সংযোজক সামাজিক প্রক্রিয়া এবং (২) বিয়োজক সামাজিক প্রক্রিয়া। বর্তমান এবং পরবর্তী একক দু'টিতে এই দু'প্রকার সামাজিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

সংযোজক সামাজিক প্রক্রিয়া (Associative Social Process) ঃ

যে সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়া ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সমন্বয় সাধনে বা ঐক্য নির্মানে সহায়তা করে সেই সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়াকে সংযোজক সামাজিক প্রক্রিয়া বলে।

উদাহরণ ঃ সহযোগিতা, উপযোজন, আত্তীকরণ প্রভৃতি।

সহযোগীতা (Cooperation) ঃ

সহযোগিতা (Cooperation) হল সমাজের ভিত্তিমূলক, সর্বপরিব্যপ্ত ধারাবাহিক এবং অবিচ্ছেদ্য সামাজিক প্রক্রিয়া। সমাজজীবনের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হল সহযোগিতা। সাধারণ অর্থে, সহযোগীতা বলতে বোঝায় সাধারণ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে একাধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর একত্রে কাজ করা। ইংরাজী শব্দ Cooperation-এর ব্যুৎপত্তি দু'টি ল্যাটিন শব্দের সমাহারে। 'Co'-ল্যাটিন এই শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া বা একত্রে এবং 'Operari' শব্দের অর্থ কাজ করা। সুতরাং, ব্যুৎপত্তিগত অর্থে 'Cooperation' বলতে বোঝায় সাধারণ স্বার্থপূরণ বা প্রাপ্তির লক্ষ্যে একযোগে কাজ করা।

সংজ্ঞা ঃ এ. ডব্লু. গ্রীণ-এর মতে, সহযোগিতা হল দুই বা ততোধিক ব্যক্তি কর্তৃক অবিচ্ছিন্ন ভাবে এবং একযোগে গৃহীত উদ্যম এবং প্রচেষ্টা যা তাদের একটি নির্দিষ্ট সাধারণভাবে অভীষ্ট কার্যসিদ্ধিতে বা সাধারণভাবে ঈপ্সীত লক্ষ্যপূরণে সহায়তা করে।

অধ্যাপক ফেয়ারচাইল্ড-এর লেখনী অনুসারে, সহযোগিতা হল এমন এক প্রক্রিয়া যা দ্বারা একটি সাধারণ লক্ষ্যপূরণ অথবা সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গ নিজেদের সমস্ত কর্মক্ষমতাকে কম বেশী সাংগঠনিক উপায়ে একত্রিত করে। সহযোগিতা বলতে সাধারণ স্বার্থ পূরণের লক্ষ্যে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গের একত্রে মিলেমিশে কাজ করার প্রক্রিয়াকে বোঝান হয়। সমাজজীবনে সহযোগীতা সর্বপরিব্যাপ্ত। ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠী অর্থাৎ দু'জন ব্যক্তি সমন্বিত একটি গোষ্ঠী থেকে শুরু করে আধুনিক বিশ্বের দু'টি বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যেও সহযোগিতা একটি অবিচ্ছেদ্য সামাজিক প্রক্রিয়া রূপে বর্তমান।

একটি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে সহযোগিতা কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। যথাঃ—পারস্পরিক সমমনস্কতা, সমউদ্দেশ্য, পারস্পরিক সচেতনতা, বোঝাপড়া এবং কিছুটা হলেও নিঃস্বার্থ দৃষ্টিভঙ্গী।

প্রকারভেদ ঃ

সহযোগিতা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ দু'প্রকারের হতে পারে। আবার চরিত্রগত ভাবে একে প্রাথমিক, দ্বিতীয় পর্যায়স্থ গৌণ (secondary) তৃতীয় পর্যায়স্থ গৌণ (tertiary) এই তিন প্রকারে বিভক্ত করা যায়।

প্রত্যক্ষ সহযোগিতা ঃ এই প্রকার সহযোগিতায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেকে একই ধরণের কার্য করে থাকে। **উদাহরণ ঃ** একত্রে ভূমি কর্ষণ করা, একত্রে খেলা করা, একত্রে আরাধনা করা ইত্যাদি। একত্রিত ভাবে একই কার্য করার মাধ্যমে যে সামাজিক সন্তুষ্টি উৎপন্ন হয় তা সামাজিক ঐক্যসাধনে সহায়তা করে।

পরোক্ষ সহযোগিতা ঃ এই প্রকার সহযোগিতায় দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একই সাধারণ উদ্দেশ্য পূরণের নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকারের কার্যে নিযুক্ত থাকে। শ্রমবিভাজন এবং শ্রমের বিশেষীকরণের সূত্রের উপর ভিত্তি করে এই প্রকার সহযোগিতা গড়ে ওঠে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা, প্রধান শিক্ষক/শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী, দারোয়ান, মালী, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী প্রত্যেকে স্ব স্ব বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত থাকেন। কিন্তু একত্রিত ভাবে তাঁদের দ্বারা একটি প্রতিষ্ঠান হিসাবে বিদ্যালয়ের মূল উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিক্ষা দান-এর প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। আধুনিক প্রযুক্তির যুগে সমাজে বিশেষীকৃত দক্ষতা এবং কার্যাবলীর গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং, আধুনিক সমাজে পরোক্ষ সহযোগিতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

প্রাথমিক সহযোগিতা (Primary Co-operation) ঃ প্রাথমিক গোষ্ঠী অর্থাৎ পরিবার, প্রতিবেশীবর্গ বন্ধুগোষ্ঠী, শিশুদের খেলার দল প্রভৃতিতে এরূপ সহযোগিতা প্রত্যক্ষ করা যায়। এক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রতিটি সদস্য-ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং তাদের কার্যাবলী পারস্পরিক বন্ধনে আবদ্ধ থেকে পরস্পরের হিতাকাঙ্খায় সহযোগিতা করে।

গৌণ সহযোগিতা (Secondary Co-operation) ঃ আধুনিক সভ্য সমাজের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গৌণ সহযোগিতার প্রাধান্য। ইহা প্রধানতঃ গৌণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। আনুষ্ঠানিকতা এবং বিশেষীকরণ এই ধরণের সহযোগিতার বৈশিষ্ট্য। গোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের মধ্যে গোষ্ঠীর প্রতি এক ধরণের বিশেষ আনুগত্য এবং দায়িত্ববোধ বিরাজ করে এবং তারা প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব বিশেষীকৃত কর্তব্য এমনভাবে সম্পাদন করে যাতে অন্যদের পক্ষে তাদের জন্য নির্দিষ্ট কর্তব্য সম্পাদন করা সম্ভব হয়। ফলে, প্রত্যেকে নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ মজুরী, বেতন, পদোন্নতি, লাভ, ক্ষমতা, মর্যাদা প্রভৃতি প্রাপ্তির আশা নিজ নিজ কর্ম সুসম্পাদন করলেও, সকলের দ্বারা সম্পাদিত পরিপূর্ণ কার্যের সুফল গোষ্ঠীর সদস্যরা প্রত্যেকে আলাদা আলাদা ভাবে ভোগ করতে পারে।

দ্বিতীয় স্তরের গৌণ সহযোগিতা (Tertiary Co-operation) ঃ দ্বিতীয় স্তরের গোষ্ঠীর অর্থাৎ সমাজস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, জাতি গোষ্ঠী, ধর্মীয় গোষ্ঠী ইত্যাদির মধ্যে এই ধরণের সহযোগীতা দেখা যায়। এধরণের সহযোগীতায় সহযোগী গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্যের সামান্য তারতম্য থাকলেও নিজ নিজ উদ্দেশ্যপূরণের পথ একই হয়। **উদাহরণ ঃ** শিল্প কারখানায় শ্রমিক এবং ম্যানেজমেন্ট উভয়ে নিজ নিজ স্বার্থ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উভয়ের সহযোগীতায় উভয়ের স্বার্থ পূরণ হতে পারে।

সমাজ জীবনে সহযোগিতার গুরুত্ব ঃ

সহযোগিতা একটি সার্বজনীন এবং নিরবচ্ছিন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া। মানবজীবনের ধারাবাহিক অস্তিত্বের জন্য যেমন এই প্রক্রিয়ার মানসিক এবং জৈবিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য, তেমনই এটি মানব জীবন নির্বাহের প্রাথমিক সামাজিক শর্ত। ইয়ং এবং ম্যাক-এর মতে, সমাজে সহযোগিতা নামক প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী গুরুত্বপূর্ণ—

(ক) একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পূরণের ইচ্ছা বা প্রেরণা।

(খ) একযোগে কাজ করার উপকারিতা সম্পর্কে সদস্যদের নির্দিষ্ট জ্ঞান থাকা দরকার।

(গ) সদস্যদের মধ্যে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কার্য এবং তার সুফল সমানভাবে ভাগ করে নেওয়ার প্রবণতা।

(ঘ) সহযোগিতার মাধ্যমে পরিকল্পনা মাফিক নিজ নিজ কার্য সুসম্পন্ন করার মত দক্ষতা লাভ।

পুরুষ এবং নারীর পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই প্রজনন এবং শিশু প্রতিপালন সম্ভব, যা যুগ যুগ ধরে মানব জাতির ধারাবাহিক আগ্রহের জন্য একান্ত প্রয়োজন। আদিম কাল থেকেই মানুষ তার খাদ্য, আত্মরক্ষা এবং বংশবৃদ্ধি—অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় এই তিনটি ন্যূনতম শর্ত পূরণের জন্য সহযোগিতার উপরই নির্ভরশীল। সহযোগিতার মাধ্যমেই সমাজের প্রগতি এবং উন্নয়ন সম্ভব। সমাজে ঐক্যবদ্ধ যৌথ কার্য এবং সহযোগিতার মাধ্যমেই সর্বক্ষেত্রে—বিজ্ঞান-প্রযুক্তি, কৃষি-শিল্প, পরিবহন যোগাযোগ ব্যবস্থা—উন্নতি সাধন সম্ভব। যৌথ জীবনের উৎস হল সহযোগিতা। বর্তমান বিশ্বে সহযোগিতার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধুমাত্র ব্যক্তিবর্গ, গোষ্ঠীবর্গ, বিভিন্ন সমিতি বা সংগঠনগুলির মধ্যে নয়, বিভিন্ন রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে সহযোগিতা

মানব সমাজের সুরক্ষা এবং অস্তিত্বের জন্য অবশ্য প্রয়োজন। আধুনিক বিশ্বে উদ্ভুত বহু আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং বিতর্কের সুষ্ঠু সমাধান বিদ্যমান নামগ্রহণ, সহযোগীতার মাধ্যমে লাভ করা সম্ভব। সর্বোপরি, বর্তমান সমাজে মানুষের মধ্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং স্বাধিকারের গুরুত্ব যত প্রকাশ পাচ্ছে, সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তাও সমাজ রক্ষার্থে তত বেশী অনভূত হচ্ছে।

সামাজিক মিথস্ক্রিয়া (Social Interaction) ঃ

মিথস্ক্রিয়া হল সমাজের ভিত্তি স্বরূপ, সমাজ জীবনের অস্তিত্বের নির্যাস। সমাজ এবং সংস্কৃতির জঙ্গমতার অধ্যয়নে তাই 'সামাজিক মিথস্ক্রিয়া' ধারণাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখতে হবে, কোন একস্থানে একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকলেই একটি সামাজিক একক বা গোষ্ঠী তাদের নিয়ে গড়ে ওঠে না। সামাজিক একক তখনই তৈরী হয় যখন ঐ ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে কোন না কোন ভাবে মিথস্ক্রিয়া ঘটায় (কথা বলে, একত্রে কোন কাজ করে, ভাব-বিনিময় করে, খেলা করে, ঝগড়া করে অথবা সহযোগীতা করে বা পরস্পরের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তাদের নিজেদের ব্যবহার ও কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে)।

সংজ্ঞা ঃ

এল্ডরেজ এবং মেরিল এর মতে, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া এমন একটি সাধারণ প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পরের সঙ্গে অর্থপূর্ণ সংযোগ স্থাপন করে এবং তার ফলে উক্ত ব্যক্তিবর্গের ব্যবহারে সামান্য হলেও কিছু পরিবর্তন সংঘটিত হয়।

উত্তেজক প্রদান/প্রেরণ এবং প্রতিক্রিয়াজ্ঞাপনের মাধ্যমে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি পরস্পরের উপর যে প্রভাব বিস্তার করে তাকে মিথস্ক্রিয়া বলা হয়।

মিথস্ক্রিয়ার শর্তাবলী ঃ

পার্ক এবং বার্জেসের মতে মিথস্ক্রিয়া ঘটার জন্য দু'টি শর্ত পূরণ অবশ্য প্রয়োজন ঃ

(ক) সংযোগ (Contact)

(খ) ভাব বিনিময় (Communication)

সংযোগ ঃ মিথস্ক্রিয়ার প্রথম স্তর হল সংযোগ যার অর্থ দুই বা ততোধিক সামাজিক একক (ব্যক্তি)-এর পরস্পরের কাছাকাছি আসা বা একত্রিত হওয়া। এই সংযোগ দু'প্রকারের হতে পারে ঃ

(ক) সময়ের সংযোগ (Contact in time)

(খ) স্থান-এর সংযোগ (Contact in space)

দু'টি ভিন্ন প্রজন্মের ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংযোগ ঘটে প্রথা, ঐতিহ্য, লোকপ্রথা লোকনীতি প্রভৃতির মাধ্যমে। একে সময়/কাল-এর সংযোগ বলে। আবার নির্দিষ্ট স্থান বা অঞ্চলে সমসাময়িক ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সংযোগকে বলে স্থান-এর সংযোগ। সংযোগ ব্যক্তিগত, নৈর্বক্তিক, প্রাথমিক বা গৌণ যে কোন প্রকারের হতে পারে।

ভাব বিনিময় ঃ মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যম হল ভাব বিনিময়। এক্ষেত্রে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ব্যবহার থেকে তার চিন্তা বা অনুভূতি সম্পর্কে অনুমান করে নেন। ভাব-এর আদান প্রদান ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আবেগীয় এবং বৌদ্ধিক তিনটি স্তরে ঘটতে পারে। এরমধ্যে তৃতীয় স্তর অর্থাৎ বৌদ্ধিক স্তরে ভাব বিনিময় কেবলমাত্র মানুষের পক্ষেই সম্ভব। শব্দ এবং ভাষা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভাষার মাধ্যমে মানুষ তার নিজস্ব বিমূর্ত ধারণা বা ভাবগুলি অন্যান্যদের কাছে স্পষ্ট করে তুলে ধরতে পারে। ভাষার মাধ্যমে সংস্কৃতিক প্রবহমান থাকে।

প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া এবং প্রতীকি মিথস্ক্রিয়া ঃ দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক সংযোগের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ মিথস্ক্রিয়া ঘটে।

উদাহরণ ঃ স্পর্শ করা, ধাক্কা দেওয়া ইত্যাদি।

অপরপক্ষে, প্রতীকি মিথস্ক্রিয়া ভাষা অথবা ইঙ্গিতের ব্যবহারের মাধ্যমে মৌখিক বা লিখিত উভয় উপায়েই গটতে পারে। বহু অভিজ্ঞতার সমষ্টি বা নির্যাস দ্বার এক একটি প্রতীক নির্মিত হয়। একটি প্রতীক একটি নির্দিষ্ট ঘটনা, কার্য, গুণ, মূল্যবোধ, অনুভূতি, প্রতিক্রিয়া প্রভৃতি বহু কিছুর প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, ভাষা হল প্রতীক সমূহের অফুরন্ত ভাণ্ডার।

প্রত্যক্ষ বা প্রতীকী যে কোন ধরণের মিথস্ক্রিয়ার কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল পারস্পরিক উত্তেজক বিনিময় এবং তৎসংশ্লিষ্ট পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন।

মিথস্ক্রিয়ার গুরুত্ব ঃ

সমাজের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হল মিথস্ক্রিয়া। সমস্ত রকম সামাজিক প্রক্রিয়াই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত। পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমেই ব্যক্তিত্ব গঠন সম্ভব। অপরাপর গোষ্ঠীর সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়া ব্যতীত কোন একটি গোষ্ঠীর উন্নতি সম্ভব নয়। বহু মানুষের পারস্পরিক মিথষ্ক্রিয়ার ফলশ্রুতিই তো সমাজ। সমাজে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম-নীতি-মূল্যবোধ, আইন-প্রথা, সামাজিক প্রত্যাশা এবং ব্যবহারিক সম্ভাব্যতার জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে ক্ষুদ্র থেকে বৃহত্তর সমাজে মিথষ্ক্রিয়া সম্ভব হয়। মানব প্রকৃতি এবং সমাজ কাঠামোর নির্মান, অগ্রগতি এবং পরিবর্তন সবই সামাজিক মিথষ্ক্রিয়ারই অবদান।

উপযোজন (Accommodation) ঃ

উপযোজন সামাজিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে অন্যতম এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এটি এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মানুষ সমাজ জীবনে বিভিন্ন বিরুদ্ধ মত, অবস্থা বা পরিস্থিতির সঙ্গে হয় আপস করে বা মীমাংসা করে বা মানিয়ে নিয়ে একত্র সহাবস্থান সম্ভব করে। উপযোজন এমন এক প্রক্রিয়া যা সমাজজীবনে দ্বন্দ্বরত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গের প্রত্যেকের বাহ্যিক আচরণে এমন কিছু পরিবর্তন সূচিত করে যা দ্বারা তাদের দ্বারা একত্র সহাবস্থান এবং একত্র কর্মসম্পাদন সম্ভব হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে মত পার্থক্য এবং ঝগড়া যেমন অত্যন্ত স্বাভাবিক; আবার কিছু সময় পর বিষয়টি ঘিরে মতান্তর মিটুক বা না মিটুক; উভয়ের একত্র সহাবস্থান, কর্মসম্পাদন এবং শান্তিপূর্ণ

পারিবারিক জীবন যাপন—এ ও অত্যন্ত স্বাভাবিক সামাজিক চিত্র। কলেজ কর্তৃপক্ষের কান সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্ররা হয়তো একবেলা বা একদিন ক্লাস বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কিছু সময় পরে কর্তৃপক্ষ এবং ছাত্রদের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোন না কোন সমঝোতা হয় এবং ছাত্ররা আবার ক্লাসে ফিরে আসে। দ্বন্দ্বরত দুষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মধ্যে আপোষ, মীমাংসা বা সমঝোতার এই প্রক্রিয়াকেই সমাজতত্ত্বে উপযোজন প্রক্রিয়া বলা হয়।

সংজ্ঞা ঃ

প্রখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ জে. এম. বল্ডউইন সর্বপ্রথম উপযোজন ধারণাটির ব্যবহার করেন। তাঁর মতে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলার স্বার্থে ব্যক্তি তার ব্যবহারে বা আচরণে যে পরিবর্তন সাধন করে, সেই অর্জিত আচরণগত পরিবর্তন সমূহকে বলে উপযোজন।

ম্যাক আইভারের মতে, উপযোজন বলতে সেই সামাজিক প্রক্রিয়াকে বোঝানো হয় যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিবেশের সঙ্গে ঐক্যমত্য অর্জন করে।

অগবার্ন এবং নিমকফের মতানুসারে, উপযোজনের ধারণাটি সমাজতত্ত্ববিদগণ ব্যবহার করেছেন পরস্পর শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে সমঝোতা সাধনের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে।

বৈশিষ্ট্য ঃ

● দ্বন্দ্বের স্বাভাবিক ফলশ্রুতি হল উপযোজন। সমাজে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি বাস্তব। কিন্তু দ্বন্দ্ব অনন্তকাল চলতে পারে না। তাই দ্বন্দ্বের সাময়িক মীমাংসা বা আপোষ-এর জন্য উপযোজন প্রক্রিয়া সমাজে গুরুত্বপূর্ণ।

● উপযোজন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সচেতন বা অচেতন উভয় অবস্থাতেই ঘটতে পারে। জন্মের পর থেকেই শিশুকে তার প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে হয়। সমাজের নিয়ম-কানুন, প্রথা, রীতিনীতি প্রভৃতির সঙ্গে তার মানিয়ে চলা, পরিবার, জাতি, রাষ্ট্র-এর একজন হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলা প্রভৃতি বেশীর ভাগই অচেতন উপযোজনের ফলশ্রুতি। উপযোজন তখনই সচেতনভাবে ঘটে যখন দ্বন্দ্বরত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গ পরিকল্পিতভাবে যুদ্ধ বিরতি এবং সহাবস্থানের প্রচেষ্টায় আপোষ বা সমঝোতা করে।

উদাহরণ ঃ যুদ্ধরত দু'টি রাষ্ট্রশক্তি যুদ্ধ বিরতির নিমিত্ত চুক্তি সাক্ষর করে।

● উপযোজন একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। যে কোন সমাজে দ্বন্দ্বের অবস্থান অবশ্যম্ভাবী। আবার অন্তহীন দ্বন্দ্ব সমাজের সুষ্ঠ জীবনযাত্রাকে ব্যাহত করে। সুতরাং প্রতিট সমাজে এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে দ্বন্দ্ব নিরসনের প্রক্রিয়া হিসাবে উপযোজনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

● উপযোজন একটি নিরবচ্ছিন্ন এবং ধারাবাহিক প্রক্রিয়া।

● উপযোজনের ফলশ্রুতি বিভিন্ন পরিস্থিতি অনুসারে বিভিন্ন রকম হতে পারে। কখনো উপযোজনের ফলে দ্বন্দ্ব প্রশমিত হয়, কখনো বা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে কিছু সময়ের জন্য বিরতি ঘোষিত হয়।

প্রকারভেদ ঃ

ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা পরিস্থিতির তারতম্য অনুসারে উপযোজন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। গিলিন এবং গিলিন তাঁদের রচনাতে উপযোজনের নিম্নলিখিত সাতটি প্রকারের উল্লেখ করেছেন ঃ

১. **বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ঃ** দ্বন্দ্বরত ব্যক্তিদ্বয় বা গোষ্ঠীদ্বয় অসম ক্ষমতার অধিকারি হলে, বলপ্রয়োগ বা বলপ্রয়োগের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে দুর্বলতর পক্ষকে বাধ্য করা হয় সমঝোতার শর্তগুলি স্বীকার করে নিতে। উদাঃ যুদ্ধে বিজয়ী রাষ্ট্র তার শর্তাবলী চাপিয়ে দেয় পরাজিত রাষ্ট্রের উপর।

২. **আপোষ ঃ** দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলি সমক্ষমতা-সম্পন্ন হলে, উপযোজনের প্রধান পথ হয় আপোষ। এক্ষেত্রে দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলির প্রত্যেকে নিজ নিজ দাবী বা অবস্থান থেকে কিছুটা হলেও সরে আসে এবং নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব মীমাংসা/শান্তি স্থাপনে সক্ষম হয়। উদাঃ—মজুরী, শ্রম-ঘণ্টা প্রভৃতি বিষয়কে ঘিরে শিল্প-কারখানায় শ্রমিক এবং পরিচালক সংস্থা (management body)-এর মধ্যে বিরোধ সাধারণতঃ আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমেই সমাধান হয়।

৩. **দ্বন্দ্ব প্রশমনে তৃতীয় পক্ষ ঃ**

(ক) সালিশী (Arbitration) ঃ যখন দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলি নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাধানে সক্ষম হয় না। তারা উপযোজনের মাধ্যম হিসাবে সালিশী ব্যবস্থার দ্বারস্থ হয়। এই ব্যবস্থায় একটি নির্বাচিত তৃতীয় পক্ষ (যা দ্বন্দ্বরত উভয়পক্ষ দ্বারা নির্বাচিতও হতে পারে) দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রচেষ্টা বলায় এবং এই তৃতীয় পক্ষের দ্বারা নির্দিষ্ট সমাধান শর্তাবলী দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলি স্বীকার করে নিতে বাধ্য থাকে। উদাঃ আন্তর্জাতিক বা আন্তরক্ষীয় দ্বন্দ্বে UNO-এর ভূমিকা।

(খ) মধ্যস্থতা (Mediation) ঃ সালিশীর ন্যায় এ ব্যবস্থাতেও এক তৃতীয় পক্ষ নিরপেক্ষতা বজায় রেখে দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলির মাঝখানে উপস্থিত থাকে এবং দ্বন্দ্ব সমাধানের প্রচেষ্টা চালায়। তবে সালিশ (arbitrator)-এর ন্যায় মধ্যস্থতাকারীর দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলির উপর কর্তৃত্ব থাকে না। মধ্যস্থতাকারীর নির্দেশ বা সমাধান চুক্তি দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলির জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক নয়।

(গ) দ্বন্দ্ব প্রশমন (Concilliation) ঃ নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতিতে দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলিকে পরস্পরের নিকটতর করে তোলা, বিরোধীতার মনোভাব কমিয়ে সহমত্য স্থাপনের প্রক্রিয়াকে বলে দ্বন্দ্ব প্রশমন (Concilliation)।

৪. **সহ্য (Toleration) ঃ** উপযোজনের এই রূপভেদটিতে দ্বন্দ্ব মীমাংসা অপেক্ষা দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলার উপর জোর থাকে বেশী। দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলি অনুধাবন করে যে তাদের মত পার্থক্য ঘোচার নয়। সুতরাং কোনরকম আনুষ্ঠানিক চুক্তি বা মীমাংসার দিকে না গিয়ে তারা সরাসরি পরস্পর পার্থক্য সত্ত্বেও পাশাপাশি অবস্থানের পথ বেছে নেয়।

৫. **অবস্থান্তর (Conversion) ঃ** উপযোজনের এই রূপভেদটিতে দ্বন্দ্বরত পক্ষগুলির কোন একটি (দুর্বলতর পক্ষ) অকস্মাৎ তাদের নিজস্ব বিশ্বাস, ভক্তি, আনুগত্য প্রভৃতি পরিত্যাগ করে অপর পক্ষের

বিশ্বাস, ভক্তি, ভাবাদর্শ ও আনুগত্য স্বীকার করে নেয়। সাধারণতঃ ধারণাটির ব্যবহার ধর্মান্তরিতকরণ-এর ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হলেও সাহিত্য, অর্থনীতি, শিল্পকলা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে উপযোজনের আলোচনাতে বর্তমানে এর ব্যবহার বহুল প্রচলিত।

৬. উচ্চস্তরীয় ব্যবহারিক পরিবর্তন (Sublimation) ঃ উপযোজনের এই রূপভেদটিতে অহিংস কার্যকলাপ দ্বারা হিংসাত্মক কার্যকলাপকে প্রতিরোধ এবং প্রতিস্থাপনের কথা বলা হয়। যীশুখ্রষ্ট, গান্ধীজী প্রমুখ দ্বারা প্রচারিত দ্বন্দ্ব সমাধানের পথ এই রূপভেদটির অন্তর্ভুক্ত।

৭. যুক্তিযুক্তকরণ (Rationalization) ঃ নিজ ত্রুটি, দায় বা অপরাধ ঢাকার জন্য বা দায় এড়ানোর জন্য অনেক সময় কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপর কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর কার্যকলাপকে তার নিজস্ব ত্রুটিপূর্ণ কার্যের কারণ হিসাবে দেখিয়ে নিজ ত্রুটি/ দায়/ অপরাধকে যুক্তিপূর্ণ বলে প্রমাণের চেষ্টা করে, দায় প্রশমিত করতে চায় বা অন্যের কাঁধে দায় চাপিয়ে নিজেদের দ্বন্দ্ব থেকে সরিয়ে নিতে চায়। এই প্রক্রিয়াকে বলে যুক্তিযুক্তকরণ দ্বারা উপযোজন।

উদাহরণ ঃ ইরাক যুদ্ধ এবং ইরাক আক্রমণের পিছনে কারণ হিসাবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া যুক্তি-ইরাকে লুকানো পারমাণবিক অস্ত্রভাণ্ডার ধ্বংস এবং তদ্বারা বিশ্ব পৃথিবীর সুরক্ষা সাধন।

আত্তীকরণ (Assimilation) ঃ

দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গ পরস্পরের নিকটবর্তী হলে প্রতিনিয়ত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের উভয়ের নিজস্ব সংস্কৃতিতে ধীরে ধীরে পরিবর্তন সাধিত হয় যা ভিন্ন সংস্কৃতি থেকে কিছু উপাদান নিজের নিজের সংস্কৃতিতে প্রবেশের ফল। ধীরে ধীরে একটি সংস্কৃতি (বৃহত্তর) অপর সংস্কৃতিকে (ক্ষুদ্রতর) অধিগ্রহণ করে এমন ভাবে যাতে এক সময় তাদের পূর্বের ভিন্নতার চিহ্ন প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। উপযোজনের চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী, দীর্ঘমেয়াদী এই সামাজিক প্রক্রিয়াকে বলে আত্তীকরণ।

সংজ্ঞা ঃ

অধ্যাপক অগবার্ন ও নিমকফের মতে, আত্তীকরণ এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একদা ভিন্নতা সম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গ ক্রমশঃ এক এবং অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি এবং স্বার্থসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গে পরিণত হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

● আত্তীকরণ প্রক্রিয়া কোন বিশেষ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ নয়। আত্তীকরণের ধারণাটি দু'টি ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মিশ্রণ বোঝাতে সাধারণতঃ ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ধারণাটি একটি মাত্র ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নয়। শিশুরা ধীরে ধীরে পূর্ণবয়স্কদের গোষ্ঠীতে মিশে যায়। স্বামী এবং স্ত্রী দু'টি ভিন্ন পারিবারিক জীবন থেকে এসে একত্রিত হন এবং ক্রমে ক্রমে একটি অভিন্ন স্বার্থবিশিষ্ট সমদৃষ্টিভঙ্গির ঐক্যবদ্ধ একক গঠন করেন। গোষ্ঠীজীবনে একজন ব্যক্তির সমগ্র জীবনকাল ব্যাপী আত্তীকরণ প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

● আত্তীকরণ একটি ধীরগতিসম্পন্ন এবং দীর্ঘমেয়াদী সামাজিক প্রক্রিয়া। ইহা অকস্মাৎ সম্পন্ন হতে

পারে না। ভিন্ন গোষ্ঠীদ্বয়ের পারস্পরিক সংযোগের সুযোগ এবং প্রকৃতির উপর নির্ভর করে আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার গতি।

● আত্তীকরণ বহুলাংশে একটি অচেতন প্রক্রিয়া। আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গ প্রায়শঃই নিজেদের অগোচরে নিজ নিজ সংস্কৃতি বা আচরণে পরিবর্তন ঘটিয়ে ফেলে এবং নতুন আচরণবিধি বা নতুন সংস্কৃতিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

● আত্তীকরণ একটি দ্বিমুখী প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ায় আদান-প্রদানের সূত্রটি বিশেষভাবে কার্যকরী হয়। আত্তীকরণ প্রক্রিয়ার পূর্ববর্তী ধাপ অবশ্যই সাংস্কৃতিক মিশ্রণ। দু'টি ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী পরস্পরের সংযোগে এলে তাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক উপাদানের আদান-প্রদান ঘটে, যা উভয় গোষ্ঠীর সংস্কৃতিকেই প্রভাবিত করে। তবে, সাধারণতঃ দূর্বলতর সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সবল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী দ্বারা বেশী প্রভাবিত হয়।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তুদের আগমন এবং আদি পশ্চিমবঙ্গীয়দের সঙ্গে তাদের নিত্য সংযোগের ফলে ভাষার মিশ্রণ ঘটে আজকের মূলস্রোতের বাংলাভাষা (কথ্য) তার বর্তমান রূপটি লাভ করেছে। রান্নাবান্না বা অন্যান্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই আত্তীকরণের প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

আত্তীকরণে সাহায্যকারী উপাদান সমূহ ঃ

● **সহনশীলতা ঃ** ভিন্নতা সম্পন্ন গোষ্ঠীবর্গ বা ব্যক্তিবর্গ যদি পরস্পরের সাংস্কৃতিক ভিন্নতার প্রতি সহনশীল হয়, তবেই আত্তীকরণ প্রক্রিয়া সফল হতে পারে। পারস্পরিক সহনশীলতা থাকলে তবেই ভিন্ন গোষ্ঠীর ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মেলামেশা, সংযোগ, একত্রে মিলিত ভাবে সাধারণ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদন সম্ভব হয়। সাধারণতঃ সবলতার গোষ্ঠীটি নিজ নিরাপত্তা সম্পর্কে যত নিশ্চিত হয়, তার আতিথেয়তা এবং ভিন্নতা সম্পর্কে সহনশীলতা ও তত বেশী হয়। ফলে দুর্বলতর গোষ্ঠীটির পক্ষেও সমাজজীবনে সম্পূর্ণভাবে যোগদান এবং একত্রীকরণ সহজতর হয়।

● **অন্তরঙ্গ সামাজিক সম্পর্ক ঃ** সামাজিক সংযোগের ফলশ্রুতি হল আত্তীকরণ, যার গতি নির্ভর করে সংযোগের প্রকৃতি এবং সুযোগের উপর। প্রাথমিক গোষ্ঠীতে (যথা—পরিবার, বন্ধুগোষ্ঠী) অত্যন্ত দ্রুত ও স্বাভাবিক নিয়মেই তা প্রক্রিয়া ঘটে থাকে। অপরপক্ষে, দু'টি ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংযোগ যদি গৌণ প্রকৃতির হয়, অর্থাৎ সংযোগের প্রকৃতি যদি পরোক্ষ, নৈর্ব্যক্তিক এবং অগভীর হয় তবে আত্তীকরণও অত্যন্ত ধীরগতিসম্পন্ন দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়।

● **আন্তঃ বিবাহ ঃ** দু'টি ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মধ্যে বিবাহ যদি তাদের লোকনীতি বা প্রতিষ্ঠানিক কাঠামোতে বৈধতা পায়, তবে ঐ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আত্তীকরণ সহজতর হয়।

● **সাংস্কৃতিক মিলন ঃ** যদি দু'টি ভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মূল সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যে মিল থাকে, তবে উক্ত দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আত্তীকরণ সহজতর হয়।

● **শিক্ষা ঃ** সংস্কৃতিক সংযোগের একটি প্রধানতম হাতিয়ার হল শিক্ষা। অভিবাসী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে আশ্রয়দাতা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় শিক্ষা ব্যবস্থা উক্ত রাষ্ট্রের সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের অন্যতম প্রধান মাধ্যম।

● **সমান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ঃ** একই অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন সাসস্কৃতিক গোষ্ঠী সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সুযোগ সুবিধা যদি সমানভাবে লাভ করে, তবে তাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসবোধ গড়ে ওঠে এবং তাদের মধ্যে ঐক্যপূর্ণ সংযোগ স্থাপন সম্ভব হয়।

আত্তীকরণে বাধা সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহ ঃ

● **বিচ্ছিন্ন অবস্থান (Isolation) ঃ** যদি ভিন্নতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগা নিয়মিত এবং নিরবচ্ছিন্ন হয়, তবে আত্তীকরণ সহজতর হয়। সুতরাং পারস্পরিক দূরত্ব, অবস্থানগত হোক বা মানসিক, আত্তীকরণের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে।

● **আকৃতিগত বা জাতিগত বৈষম্য ঃ** আকৃতিগত বা বর্ণগত বৈষম্য অনেক সময় পারস্পরিক বিভেদ ও বৈষম্যের ভিত প্রস্তুত করে, যা আত্তীকরণের বিরোধী। উদাহরণ ঃ— সাদা চামড়ার মানুষের সঙ্গে কালো চামড়ার মানুষের বিভেদ - কালো চামড়ার মানুষের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এবং তাকে কেন্দ্র করে আন্দোলন বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

● **সাংস্কৃতিক বৈষম্য ঃ** দুই গোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে সামান্যতম মিল না থাকলে, গোষ্ঠীদ্বয় পরস্পর পাশাপাশি বাস করা সত্ত্বেও পরস্পরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলে। এমনকী নিজ নিজ সংস্কৃতির উৎকর্ষ প্রতিষ্ঠার জন্য তারা পরস্পরের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে পারে। সুতরাং প্রথাগত, ধর্মগত, নীতিগত, ভাষাগত পার্থক্য বিস্তীর্ণ হলে গোষ্ঠীদ্বয়ের মধ্যে আত্তীকরণের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসে।

● **কুসংস্কার (Prejudice) ঃ** গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে বিভেদসাধনে কুসংস্কার-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সরলতর গোষ্ঠী যদি কোন নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে এবং তা তাদের দৃঢ় কুসংস্কারে পর্যবসিত হয় তবে ঐ দুই গোষ্ঠীর মধ্যে আত্তীকরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। এমনকী কুসংস্কার পরিবার, সম্প্রদায় এবং গোষ্ঠীজীবনেও আতীকরণের পরিপন্থী।

● **শসক ও শাসিতের দ্বন্দ্ব ঃ** শাসক এবং শাসিত গোষ্ঠীর মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রতিনিয়ত অবিচ্ছিন্ন সংযোগা বজায় থাকে। শাসক গোষ্ঠী যদি কোন কোন নির্দিষ্ট গৌন গোষ্ঠীর প্রতি সম সুযোগা সুবিধা প্রদর্শনে অক্ষম হয়, তবে আত্তীকরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

উপযোজন এবং আত্তীকরণ-এর পার্থক্য ঃ

উপযোজন	আত্তীকরণ
১. উপযোজন দ্বন্দ্ব প্রশমনের উদ্দেশ্যে ক্রিয়াশীল একটি দ্রুতগতির সামাজিক প্রক্রিয়া।	১. আত্তীকরণ সামঞ্জস্য বিধানকারী একটি ধীর গতিসম্পন্ন সামাজিক প্রক্রিয়া।

উপযোজন	আত্তীকরণ
২. উপযোজন দ্বন্দ্বের একটি সাময়িক সমাধান। ৩. উপযোজন সচেতন বা অসচেতন উভয় প্রকারেই ঘটতে পারে।	২. আত্তীকরণ হল স্থায়ী প্রকৃতির সামঞ্জস্য বিধান। ৩. আত্তীকরণ সাধারণতঃ একটি অসচেতন প্রক্রিয়া।

চতুর্থ একক (Unit – IV) ☐ বিয়োজক সামাজিক প্রক্রিয়া (Dissociative Social Process)

বিয়োজক প্রক্রিয়া (Dissociative Social Process) ঃ

যে সকল সামাজিক প্রক্রিয়া ব্যক্তিবর্গ এবং গোষ্ঠীবর্গের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে, বিচ্ছিন্নতা এবং বিরোধীতা সৃষ্টি করে সেই সকল সামাজিক প্রক্রিয়াকে বলে বিয়োজক প্রক্রিয়া। **উদাহরণ** ঃ প্রতিযোগিতা, দ্বন্দ্ব।

প্রতিযোগিতা (Competition) ঃ

বিশ্বজনীন অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই-এর স্বাভবিক ফলশ্রুতি হল প্রতিযোগিতা। সমাজে সকল মানুষের পক্ষে সকল ঈপ্সীত বস্তু লাভ সম্ভব নয়—এই বাস্তবতার উপরই নির্ভর করে আছে সামাজিক প্রক্রিয়ারূপে প্রতিযোগীতার সামাজিক গুরুত্ব। যখনই কোথাও কোন প্রয়োজনীয় বস্তু বা সামগ্রীর পর্যাপ্ত যোগানের অভাব থাকে, তখনই সমাজে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়।

সংজ্ঞা ঃ

পার্ক এবং বার্জেকের মতে, প্রতিযোগিতা হল এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যা পারস্পরিক প্রত্যক্ষ সামাজিক সংযোগ ব্যতীত ঘটতে পারে। হর্টন এবং হান্টের লেখনীতে, যে কোন উপহার বা পুরস্কার (reward) সেটা কোন বস্তু, মর্যাদা, ক্ষমতা, ভালোবাসা বা অন্য যা কিছু হতে পারে--- যার যোগান সীমিত তাকে নিজের অধিকারে রাখার জন্য লড়াইকে বলে প্রতিযোগিতা। অর্থাৎ বলা যায়, যে সামাজিক প্রক্রিয়া দ্বারা ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন সীমিত যোগানের উপহার/পুরস্কার নিজ একক অধিকারে রাখার জন্য প্রচেষ্টা চালায়, সেই প্রক্রিয়াকে বলে প্রতিযোগিতা।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১. অভীষ্ট বা প্রয়োজনীয় সম্পদের অপর্যাপ্ত বা সীমিত যোগান হল প্রতিযোগিতার উপস্থিতির মূল শর্ত।

২. প্রতিযোগিতা একটি নিরবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা সমাজে সকল ক্ষেত্রে, সকল মিথস্ক্রিয়াজাত সম্পর্কে, সকল কার্যে পরিলক্ষিত হয়। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান ছাড়াও অর্থ প্রতিপত্তি খ্যাতি ক্ষমতা প্রভৃতির জন্য প্রতিযোগীতা সমাজের সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে সদা লক্ষণীয়।

৩. প্রতিযোগিতা একটি সার্বজনীন প্রক্রিয়া। আদিম কাল থেকে শুরু করে আধুনিকতম সমাজে ও প্রতিযোগীতার অস্তিত্ব ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। আদিম যুগে যা ছিল কেবল মাত্র বেঁচে থাকার রসদ যোগান ও অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই, আধুনিক সমাজ জীবনে তা আজ সর্বব্যাপী—সম্পদ, মর্যাদা, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, জীবিকা, সম্মান, সম্পর্ক, পার্থিব এবং অপার্থিব সমস্ত বস্তু বা সম্পদকে অধিকারস্থ রাখার লড়াই। পৃথিবীতে এমন কোন সমাজ নেই যেখানে কেবলমাত্র সহযোগিতা বা কেবলমাত্র প্রতিযোগিতা বর্তমান। সমস্ত সমাজেই এই দুই প্রক্রিয়া অবিরত ঘটমান।

৪. প্রতিযোগিতা একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। এটি অধিক অর্জনের এবং উন্নততর জীবনের পথে চলার প্রেরণা যোগায়। এটি সমাজে পরিবর্তন সূচিত করে।

৫. প্রতিযোগিতা সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। প্রতিযোগিতার কারণে ব্যক্তিবর্গ অভীষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন ব্যবহার, প্রযুক্তি এবং দক্ষতা অর্জনে প্রচেষ্ট হয়। ফলে নতুন নতুন আবিষ্কার ঘটে, যা সমাজ পরিবর্তনে সহায়তা করে। আবার, সামাজিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ প্রতিযোগিতার জন্মও ঘটে। নতুন সমাজ নতুনতর লক্ষ্য প্রস্তুত করে, যা প্রাপ্তির জন্য সমাজে নতুনতর প্রতিযোগিতার সৃষ্টি হয়।

৬. প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকেন্দ্রীক বা নৈর্ব্যক্তিক উভয় প্রকার হতে পারে। প্রতিযোগিতা কোন লক্ষ্য পূরণ বা অর্জনের জন্য ঘটে। কোন বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ঘটে না। কিন্তু যখন কোন দুই ব্যক্তি একই কাঙ্খিত লক্ষ্যকে ঘিরে প্রতিযোগিতায় নামে, তখন প্রতিযোগিতা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বে পরিনত হতে পারে।

৭. প্রতিযোগিতার পরিণতি গঠনমূলক বা ধ্বংসাত্মক উভয় প্রকার হতে পারে। যদি পরাজিত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে বিজয়ীর জয় সূচিত হয়, তবে সেক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা ধ্বংসাত্মক। কোন শিল্পপতি যদি ব্যবসায় একাধিপত্য রক্ষার স্বার্থে ছোট ছোট ব্যবসাদারদের দেউলিয়া বানিয়ে ফেলেন, তবে সেক্ষেত্রে এই অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতা ধ্বংসাত্মক বিবেচিত হয়। তবে গঠনমূলক প্রতিযোগিতা স্বাস্থ্যকর এবং এগিয়ে চলার প্রেরণা যোগায়। শ্রেণীতে প্রথম স্থান লাভের আশায় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা সকলকে এগিয়ে চলতে উৎসাহিত করে।

৮. প্রতিযোগিতা সর্বদাই নিয়মানুসারী হয়। প্রতিযোগিতা সর্বদাই নীতিগত বা আইনগত শৃঙ্খলা দ্বারা সুরক্ষিত, ফলে অনিয়ন্ত্রিত প্রতিযোগিতার কোন স্থান সমাজে নেই।

৯. প্রতিযোগিতা অনেক সময় সচেতন ভাবে ঘটে না। অর্থাৎ প্রতিযোগীরা নিজেরাও নিজেদের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ বা অন্যান্য প্রতিযোগী সম্পর্কে সচেতন থাকে না। খানিকটা অচেতন ভাবেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়া হিসাবে সমাজস্থ ব্যক্তিগণ প্রতিযোগিতায় অংশ নেন।

প্রতিযোগিতার সামাজিক ভূমিকা বা গুরুত্ব ঃ

১. সমাজে কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট মর্যাদা নির্ধারণে সহায়তা করে প্রতিযোগিতা ব্যক্তি মর্যাদা অর্জনের জন্য সমাজে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমাজ ব্যবস্থায় কোন ব্যক্তির যোগ্য মর্যাদাগত অবস্থান সূচিত হয়। তবে বদ্ধ সমাজে অর্থাৎ যে সমাজে অর্জিত মর্যাদা অপেক্ষা আরোপিত মর্যাদার গুরুত্ব বেশী, সেখানে প্রতিযোগিতা দ্বারা মর্যাদা নির্ধারণ কষ্টসাধ্য। আধুনিক মুক্ত সমাজে প্রতিটি ব্যক্তিই প্রতিযোগী। কেউ নিজ মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য, আবার কেউ উচ্চতর মর্যাদার অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রয়াসে প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

২. প্রতিযোগিতা অনুপ্রেরণার উৎস, প্রতিযোগিতা সমাজস্থ ব্যক্তিকে তার মধ্যে নিহিত সামর্থ্য এবং উৎকর্ষ প্রদর্শনে প্রেরণা যোগায়। প্রতিযোগিতা ব্যক্তিকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনে প্রণোদিত করে।

৩. প্রতিযোগিতা সামাজিক সচলতা বৃদ্ধি করে। সমাজে ব্যক্তির অবস্থানে গতিশীলতা এবং মুক্তির পথ দেখায় প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সমাজে ব্যক্তি তার প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা অর্জন করতে পারে। সুতরাং, সমাজে উল্লম্ব সচলতা বৃদ্ধিতে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৪. প্রতিযোগিতা আর্থ-সামাজিক উন্নতিতে সহায়তা করে। সুস্থ এবং নিয়মানুগ প্রতিযোগিতা অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে। প্রতিযোগিতার অস্তিত্বহেতু প্রতিটি ব্যক্তি তার উৎকৃষ্ট প্রচেষ্টা এবং দক্ষতা প্রয়োগ করে, সুতরাং সমষ্টিগত ভাবে তা সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটায়।

৫. প্রতিযোগিতা নব নব অভিজ্ঞতা এবং আবিষ্কারের জননী। সমাজস্থ ব্যক্তির নতুন অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতি লাভের ঈপ্সা পূরণের সুযোগ করে দেয় প্রতিযোগিতা।

তবে প্রতিযোগিতা যতক্ষণ গঠনমূলক হয়, ততক্ষণই তা সমাজের পক্ষে হিতকর হয়। বাঁধনহীন প্রতিযোগীতা কিন্তু সমাজের স্থায়িত্বের পক্ষে ভয়াবহ। শৃঙ্খলাবিহীন, সীমাহীন, অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগীতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারে। তাই প্রতিটি সমাজেই প্রতিযোগিতাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম-কানুন বা আইন রচিত হয়।

দ্বন্দ্ব (Conflict) ঃ

দ্বন্দ্ব-এর উপস্থিতি সমাজের অন্যতম বাস্তবতা। সহযোগিতা ছাড়া যেমন একটি সমাজ চলতে পারে না। ঠিক তেমনি দ্বন্দ্বহীন সমাজের অস্তিত্বও অকল্পনীয়। মানব সম্পর্কে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি চিরন্তন।

সংজ্ঞা ঃ গিলিন এবং গিলিনের মতে, "দ্বন্দ্ব এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নিজ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য হিংসাত্মক উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে বা হিংসাত্মক উপায় ব্যবহারের ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লিপ্ত হয়।"

এ. ডব্লু. গ্রীণ-এর লেখনীতে, প্রতিপক্ষ বা অন্য এক বা একাধিক ব্যক্তির ইচ্ছা-আকাঙ্খাকে পরিপন্থিত উপায়ে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এবং বলপূর্বক দমনের প্রক্রিয়াই হল দ্বন্দ্ব।

হর্টন এবং হান্টের মতে, সমস্ত প্রতিযোগীদের সরিয়ে দিয়ে বা দূর্বল করে দিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যের উপর একাধিপত্য স্থাপনের প্রক্রিয়াকে দ্বন্দ্ব বলা হয়।

বৈশিষ্ট্য ঃ

১. দ্বন্দ্ব একটি সার্বজনীন সামাজিক প্রক্রিয়া। পৃথিবীতে এ যাবৎ অবস্থানকারী সমস্ত সমাজেই কোন না কোন রূপে মৃদু বা প্রবল---স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবশ্যই লক্ষ্য করা গেছে। কাল মার্কস, ফ্রেডরিক এঙ্গেলস, সাঁ সির্মো, সিমেল প্রভৃতি ক্ল্যাসিকাল সমাজচিন্তক থেকে শুরু করে পরবর্তী প্রজন্মের সমাজতাত্ত্বিকগণ যথা কোসার, গ্রামসি, আলথুসার, হেবারজাস প্রমুখের লেখনীতে মানুষের সমাজ জীবনে দ্বন্দ্বের অপরিহার্যতা এবং গুরুত্ব বিশেষ তাৎপর্যের সঙ্গে আলোচিত হয়েছে। মার্ক্সের মতে, পৃথিবীতে অদ্যাবধি বর্তমান মানব সমাজের ইতিহাস বাস্তবে শ্রেণীদ্বন্দ্বের ইতিহাস ভিন্ন আর কিছুই নয়। তাঁর মতে ইতিহাসের কালধারায় অবস্থিত যে কোন সমাজ (আদিম সাম্যবাদী সমাজ ব্যতীত) সদা বিপরীত ও সদা দ্বান্দ্বিক স্বার্থসম্পন্ন দু'টি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত---সম্পত্তির মালিকানাযুক্ত শ্রেণী এবং সম্পত্তির মালিকানাহীন শ্রেণী।

২. দ্বন্দ্ব একটি সচেতন প্রক্রিয়া। দ্বন্দ্বরত ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অত্যন্ত সচেতন ভাবেই দ্বন্দ্বে অংশ নেয়। পার্ক এবং বার্জেসের মতানুসারে, দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র চেতন প্রক্রিয়াই নয়, এটির সঙ্গে গাঢ় এবং দৃঢ় আবেগ জড়িত থাকে।

৩. দ্বন্দ্ব নৈর্ব্যক্তিক নয়, ইহা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। প্রতিযোগীতা যখন নৈর্ব্যক্তিকতা হারিয়ে ফেলে, তখন তা দ্বন্দ্বে পর্যবসিত হয়। অন্যান্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পরাজিত করার লড়াইয়ে, মূল বা অভীষ্ট লক্ষ্য তখন গৌণ হয়ে পড়ে। অন্য ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে পরাজিত করাটাই মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়।

৪. দ্বন্দ্ব কখনোই নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া নয়। কোন সমাজই নিরবচ্ছিন্ন দ্বন্দ্ব নিয়ে টিকে থাকতে পারে না। সমাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সময়ে দ্বান্দ্বিকতা বা দ্বান্দ্বিক স্বার্থসম্পন্ন গোষ্ঠীবর্গের উপস্থিতি সত্ত্বেও দ্বন্দ্ব প্রকট রূপ ধারণ করে না; প্রচ্ছন্ন রূপে সমাজে ক্রিয়াশীল থাকে।

৫. দ্বন্দ্ব সমাজে বিরোধীতার বিষয়গুলিকে সূচিত করে। ধর্ম, শ্রেণী, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, রাজনীতি, সম্পদ, রাষ্ট্রীয় স্বার্থ বা সামাজিক ও নৈতিক বিষয়—যে কোন কিছুকে কেন্দ্র করে সমাজে মতপার্থক্য, বিরোধীতা এবং স্বার্থদ্বন্দ্ব শুরু হতে পারে। আবার দ্বন্দ্বরত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গের দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠ মূল্যবোধ, আদর্শ, প্রবণতা, লক্ষ্য অথবা রাষ্ট্রীয়স্বার্থ প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে দ্বন্দ্বের রূপ এবং পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটতে পারে।

৬. দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির প্রকৃতি এবং তাদের সংস্কৃতি দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। সমাজে রাজনৈতিক অস্থিরতা রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়, দু'টি ভিন্ন ধর্মের সংঘাত সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করতে পারে। সামাজিক গোষ্ঠীগুলির সংস্কৃতিজাত মূল্যবোধ এই দ্বন্দ্বের মঞ্চটিকে নির্মান করে এবং দ্বন্দ্বের প্রকৃতিকেও প্রভাবিত করে। সংস্কৃতিগত বৈশিষ্ট্য দ্বন্দ্বকে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করে। যেখানে দ্বন্দ্ব খুবই অনিয়মিত সেইরূপ সমাজে সহসা দ্বন্দ্ব পরিস্থিতি উদ্ভব হলে, দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থার (নিয়মাবলী, আইন ইত্যাদি) অভাবে, সেখানে দ্বন্দ্ব চরম হিংসাত্মক এবং অননুমেয় রূপ পরিগ্রহ করতে পারে (উদাঃ জাতি দ্বন্দ্ব)।

৭. হতাশা এবং নিরাপত্তার অভাব থেকে সমাজে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হতে পারে অর্থ, সম্পদ, সম্মান, খ্যাতি, মর্যাদা, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ ব্যক্তিবর্গ হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বেকারত্ব, অর্থনৈতিক সংকোচন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চনা নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এই ধরণের হতাশাবোধ এবং নিরাপত্তাহীনতা সমাজে দ্বন্দ্ব প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে তোলে।

প্রকারভেদ ঃ

প্রখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক জর্জ সিমেল চার প্রকার দ্বন্দ্বকে চিহ্নিত করেছেন—

১. যুদ্ধ (War) ঃ সিমেলের মতে, ব্যক্তির অন্তস্থলে নিহিত দৃঢ়বদ্ধ চরমতম বিরোধীতা বা দ্বান্দ্বিকতার প্রকাশ হল যুদ্ধ। কিন্তু এই প্রবণতার প্রকাশ ঘটাতে হলে নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর প্রয়োজন। পার্থিব লাভের প্রয়োজনেও যুদ্ধ-প্রবণতার প্রকাশ ঘটা সম্ভব।

২. **দু'টি বংশ বা গোষ্ঠীর দীর্ঘকালীন প্রবল দ্বন্দ্ব (Feud) ঃ** এটি আন্তর্গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। এক গোষ্ঠী কর্তৃক অপর গোষ্ঠীর প্রতি অবিচারের অভিযোগে এ জাতীয় দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়।

৩. **মামলা মোকদ্দমা (Litigation) ঃ** এটি ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক নিজ অধিকার রক্ষার স্বার্থে আইনি লড়াই। প্রকৃতিগতভাবে এ ধরণের দ্বন্দ্ব অনেক বেশী বস্তুনির্ভর (objective)।

৪. **নৈর্ব্যক্তিক আদর্শ কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব ঃ** এ ধরণের দ্বন্দ্বে ব্যক্তি নিজ ব্যক্তিগত পার্থিব স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে অংশগ্রহণ করে না; বরং নিজ আদর্শকে প্রতিষ্ঠা বা স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে ব্যক্তি দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। **উদাহরণ ঃ** সাম্যবাদ এবং পুঁজিবাদের দ্বন্দ্ব।

সিমেল প্রদত্ত উপরিউক্ত প্রকারভেদগুলি ছাড়াও সমাজে দ্বন্দ্বের আরো কয়েকটি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যথা—

১. কর্পোরেট এবং ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ঃ কর্পোরেট দ্বন্দ্ব প্রকৃতপক্ষে আন্তর্গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। সমাজে কোন এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর উপর অধিকার কায়েম করতে চাইলে বা নিজ ইচ্ছা বলপূর্বক চাপিয়ে দিতে চাইলে এ ধরণের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। উদা ঃ জাতি দ্বন্দ্ব, সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, শিল্প কারখানায় শ্রমিক পরিচালন গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব, দু'টি রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব হল অন্তর্গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব। বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত প্রবণতা হিংসা, শত্রুতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি থেকে এ ধরণের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয় যা গোষ্ঠী শৃঙ্খলাকে ক্ষুণ্ণ করে।

২. **প্রকট (Overt) এবং প্রচ্ছন্ন (Lateut) দ্বন্দ্ব ঃ** সমাজে প্রবলভাবে দ্বন্দ্ব প্রকাশিত হওয়ার আগে সাধারণতঃ দীর্ঘসময়ব্যাপী যে সামাজিক অস্থিরতা, উত্তেজনা বা অসন্তোষের পরিস্থিতি তৈরী হয় তাকে প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব বলা হয়। প্রচ্ছন্ন দ্বন্দ্ব তখনই প্রকট রূপে প্রকাশিত হয় যখন কোন এক পক্ষ নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করে এবং সেই সুযোগে দ্বন্দ্বের বিষয়বস্তুকে পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করে প্রকাশ্য বিরোধীতা বা শত্রুতার কার্যক্রম চালু করে।

এাড়াও সমাজে শ্রেণী দ্বন্দ্ব (সম্পত্তির মালিক এবং মালিকানাহীন গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব), জাতি দ্বন্দ্ব (উদাঃ শ্বেতকায় এবং কৃষ্ণকায় জাতির মধ্যে দ্বন্দ্ব), জাত-দ্বন্দ্ব (শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন জাতের মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্ব, অস্পৃশ্যতাকে কেন্দ্র করে দ্বন্দ্ব), আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব (দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রশক্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব) প্রভৃতি বিভিন্ন রূপে সমাজে দ্বন্দ্ব বর্তমান।

দ্বন্দ্বের ভূমিকা ঃ

দ্বন্দ্ব একটি অন্যতম প্রধান সামাজিক প্রক্রিয়া। সিমেলের মতে, দ্বন্দ্ববিহীন সম্পূর্ণ ঐক্যমত্য সম্বলিত সমন্বয়পূর্ণ গোষ্ঠী বাস্তবে অসম্ভব, সমাজের গঠন এবং অগ্রগতির জন্য ঐক্যমত্য বা সমন্বয় যেমন প্রয়োজন তেমনি অনৈক্য, মতবিরোধ এবং অসমন্বয়-এর উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। দ্বন্দ্ব একইসঙ্গে সমাজে কিছু ইতিবাচক এবং কিছু নেতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

দ্বন্দ্বের নেতিবাচক ভূমিকা ঃ

দ্বন্দ্ব এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যার মধ্য দিয়ে চরমতম উদ্দীপনা, প্রবল ভাবাবেগের প্রকাশ ঘটে এবং যার সঙ্গে তীব্র আবেগানুভূতি যুক্ত থাকে। তাই সামাজি সংহতির পক্ষে দ্বন্দ্ব সততঃই নেতিবাচক বলে গণ হয়। গোষ্ঠীগত অন্তর্দ্বন্দ্ব-এর ফল সবচেয়ে মারাত্মক বলে বিবেচিত হয় কারণ তা গোষ্ঠীর নৈতিক অবস্থানকে অবনসিত করে এবং গোষ্ঠীর সংহতিকে দুর্বল করে তোলে।

দ্বন্দ্ব সামাজিক বিশৃঙ্খলার জনক। দ্বন্দ্বের চরমতম রূপভেদ অর্থাৎ যুদ্ধ অগণিত জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করে; মানব জীবনে অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করে এবং অবর্ণনীয় যন্ত্রণার সৃষ্টি করে। মানব ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে এই ধ্বংসলীলার প্রমাণ রয়ে গেছে। বর্তমান আধুনিক যুদ্ধ পদ্ধতি এবং পারমাণবিক অস্ত্রের যোগান ও ব্যবহার এই ধ্বংসের ভয় আরো বহু গুণে বাড়িয়ে তুলেছে।

দ্বন্দ্ব কেবলমাত্র বস্তুগত ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে তা নয়, এর নেতিবাচক প্রভাব আরো গভীরে বিস্তৃত। দ্বন্দ্ব মানসিক জগতে স্থায়ী এবং গভীর ক্ষতিসাধন করে। ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর নৈতিক জগৎ প্রবলভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় দ্বন্দ্বের ফলে। দ্বন্দ্ব মানবজীবন এবং সমাজ থেকে শান্তি কেড়ে নেয়। দ্বন্দ্বের ফলে মানুষ তার মানবিকতা হারিয়ে ফেলে। দ্বন্দ্বরত মানুষ মানবিক ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধের প্রতি তার শ্রদ্ধা এবং আস্থা হারায়। ফলে দ্বন্দ্ব-এর চরম নেতিবাচক ফলস্বরূপ মানব সমাজ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়। বর্তমানে ইজরায়েল-গাজা-প্যালেস্তাইন প্রভৃতি রাষ্ট্রে যে প্রবল দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধ চলছে, তার ফলস্বরূপ সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক সমাজজীবন প্রায় পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে। জীবন-জীবিকা এবং অস্তিত্ব সঙ্কটে ভুগছেন লক্ষ লক্ষ মানুষ। বর্তমানে দৈনিক সংবাদপত্রগুলি দ্বন্দ্বের এই নেতিবাচক পরিণাম-এর সাক্ষাৎ প্রমাণ বহন করে চলেছে।

দ্বন্দ্বের ইতিবাচক প্রভাব ঃ

সমাজ জীবনে দ্বন্দ্বের উপস্থিতি হল এক কঠিন বাস্তবতা। বহু নেতিবাচক প্রভাব সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য যে দ্বন্দ্ব বা অন্তহীন বিরোধীতা আসলে বিভিন্ন বাস্তব সমস্যার সমাধান অন্বেষণ, প্রয়োগ, বিরোধীতা, সংস্কার ধ্বংস ও পুনর্নির্মাণের মাধ্যমে সমাজকে চির গতিশীল এবং উন্নততর করার পথে ব্যবহৃত প্রধানতম প্রক্রিয়া। দ্বন্দ্বের বিভিন্ন ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হল ঃ

১. সীমিত অন্তর্দ্বন্দ্ব পরোক্ষভাবে গোষ্ঠীর স্থিতিশীলতাকে দৃঢ়তর করে তোলে। ইহা গোষ্ঠীর নেতৃত্বকে সচেতন করে এবং ফলতঃ, গোষ্ঠীর কর্মপ্রণালীকে আধুনিক রাখতে সহায়তা করে। অপরপক্ষে, গোষ্ঠীর মধ্যে অসন্তোষ বা বিরোধীতা প্রকাশের সামান্যতম পথ যদি উন্মুক্ত না থাকে, বা বিরোধীতাকে বলপূর্বক নিষ্পেষণ করা হয়, তবে তা ভবিষ্যতে ভয়াবহ আকারে প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা থাকে যা গোষ্ঠীর স্থায়িত্বের পক্ষে অপূরণীয় ক্ষতিসাধন করতে পারে।

২. অন্তর্গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে দ্বন্দ্বরত গোষ্ঠীগুলির প্রতিটির আন্তর্গোষ্ঠী ঐক্য দৃঢ়তর হয়। প্রতিটি গোষ্ঠীর সদস্যরা অন্যান্য বিভেদ ভুলে নিজ গোষ্ঠীর স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হয়। **উদাহরণ ঃ** ভারত-পাকিস্তান

যুদ্ধের সময় ভারতের সমস্ত রাজনৈতিক দল রাজনৈতিক মতাদর্শগত বিভেদ ভুলে ভারতসরকারকে পূর্ণ সমর্থন জানায়।

৩. ব্যক্তিগত পরিসরেও দ্বন্দ্ব অনেকসময় ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। মতদ্বৈধতা, বিরোধ, বিতর্ক প্রভৃতি দু'জন ব্যক্তির মধ্যে সম্পর্ককে সহজ, দৃঢ়বদ্ধ এবং পরস্পর সহনশীল ও সহানুভূতিশীল করে তোলে। বন্ধুদের মধ্যে তর্কাতর্কি, স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া প্রভৃতি একটি নির্দিষ্ট মাত্রার মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত থাকলে (পরস্পরকে আঘাত, অপমান, অশ্রদ্ধা বা নির্যাতন প্রভৃতিতে পর্যবসিত না হলে) তা একটি মুক্ত সুস্থ পরিবেশ এবং সুদৃঢ় সম্পর্কের রচনায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করে।

পরিশেষে বলা যায়, দ্বন্দ্ব এমন এক প্রক্রিয়া যা সমাজকে একপ্রকার জীবনীশক্তি যোগায়। দ্বন্দ্বই প্রগতির পথ প্রশস্ত করে। দ্বন্দ্বের মাধ্যমে সমাজস্থ ব্যক্তি, গোষ্ঠী, শ্রেণী, প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি নিজ নিজ কাঙ্খিত আদর্শকে বাস্তবায়িত করার পথ খোঁজে। দ্বন্দ্বরত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর উদ্যমের তারতম্যে দ্বন্দ্বের তীব্রতার তারতম্য ঘটতে পারে, কিন্তু দ্বন্দ্বের অনুপস্থিতি সমাজজীবনে যেমন অবাস্তব তেমনি অনভিপ্রেত; কারণ তা একপ্রকার স্থবিরতার নামান্তর।

দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগীতার মধ্যে পার্থক্য ঃ

দ্বন্দ্ব	প্রতিযোগিতা
১. দ্বন্দ্ব ব্যক্তিকেন্দ্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া।	১. প্রতিযোগীতা বিষয়কেন্দ্রিক সামাজিক প্রক্রিয়া।
২. দ্বন্দ্বে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত, বিনাশ বা অপসারিত করার চেষ্টা করা হয়।	২. প্রতিযোগীতা হল নিজ নিজ সামর্থ্য ও নৈপুণ্য অনুযায়ী অপরকে অতিক্রম করার প্রচেষ্টা।
৩. দ্বন্দ্ব সর্বদাই সচেতন প্রক্রিয়া। এর পাশ্চাতে সুচিন্তিত পরিকল্পনা কাজ করে।	৩. প্রতিযোগীতা বহু ক্ষেত্রেই অ-সচেতন কার্য-প্রক্রিয়া।
৪. দ্বন্দ্ব নিয়ন্ত্রিত করার জন্য সামাজিক/রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন থাকলেও দ্বন্দ্ব মূলতঃ অনিয়ন্ত্রিত কার্য প্রক্রিয়া।	৪. প্রতিযোগীতা একটি সুনিয়ন্ত্রিত কার্যপ্রক্রিয়া। এক্ষেত্রে সমস্ত প্রতিযোগীকে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়।
৫. দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছাতে না দেওয়াটা মুখ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।	৫. প্রতিযোগীতার মূল উদ্দেশ্য হল নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানো।
৬. দ্বন্দ্বে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে। ধ্বংসাত্মক দ্বন্দ্বে জয়ী এবং বিজিত উভয় পক্ষেরই কম বেশী ক্ষতি হয়ে থাকে।	৬. সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিযোগীদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে না। প্রতিযোগীরা ক্ষতিগ্রস্ত ও হয় না।

দ্বন্দ্ব	প্রতিযোগিতা
(৭) প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব ক্ষণস্থায়ী, দ্বন্দ্বের কারণগুলি প্রশমিত হলে বা শত্রুর বিনাশ ঘটলে প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব থেমে যায়। যদিও সমাজে দ্বন্দ্ব প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান করে। এক দ্বন্দ্বের অবসান সমাজে অন্য দ্বন্দ্বের জন্ম দেয়।	(৭) প্রতিযোগিতা একটি ধারাবাহিক ও চিরস্থায়ী বিষয়। এর কারণগুলি প্রশমিত হওয়ার কোন উপায় সমাজে নেই।

লঙ্ঘণ/বিরোধীতা (Contravention) ঃ

লঙ্ঘন/বিরোধীতা (Contravention) এমন এক বিয়োজক প্রক্রিয়া যা দ্বন্দ্ব এবং প্রতিযোগিতার মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থান করে। ইহা এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে বিরোধরত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গ প্রতিপক্ষকে তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে বা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাধা দান করে। এত্রে প্রতিপক্ষকে বাধা দেবার উদ্দেশ্য সবসময় এমন নাও হতে পারে যে ঐ নির্দিষ্ট লক্ষ্য বস্তুটি বিরোধরত প্রতিটি গোষ্ঠী বা ব্যক্তি অর্জন করতে চায়; অর্থাৎ লক্ষ্যবস্তু এক না হওয়া সত্ত্বেও এক্ষেত্রে একে অপরের বিরোধীতা করে। এটি সাধারণভাবে মৃদু এবং শান্ত দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া যেখানে প্রকাশ্য শত্রুতা বা হিংসাত্মক কার্যকলারে প্রকাশ ঘটে না।

লঙ্ঘন বিভিন্ন উপায়ে ঘটতে পারে। কার্যপ্রণালীতে পরিকল্পিত দীর্ঘসূত্রীতা বজায় রাখা, প্রতিপক্ষকে প্রকাশ্যে নিন্দা করা বা ভৎসনা করা, প্রতিপক্ষের লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টি করা, প্রতিপক্ষকে হতাশাগ্রস্ত করে তোলা, প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গুজব ছড়ানো, মিথ্যা রচনা করা প্রভৃতি লঙ্ঘন প্রক্রিয়ার বিভিন্ন রূপ। প্রতিপক্ষ সম্পর্কে কাল্পনিক বা বাস্তবিক একপেক্ষো নেতিবাচক প্রচার লঙ্ঘনের একটি বহুল ব্যবহৃত মাধ্যম।

লঙ্ঘন যতক্ষণ ব্যক্তি পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সমাজতত্ত্বের নিরিখে সামাজিক প্রক্রিয়া রূপে এটি খুব একটা গুরুত্ব লাভ করে না। কিন্তু সমাজে কোন এক গোষ্ঠী যখন অপর কোন গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সুসংগঠিত সুপরিকল্পিত উপায়ে লঙ্ঘন প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে (উদাঃ — সাম্প্রদায়িকতা, জাতিগত বিদ্বেষ প্রচার ইত্যাদি) তখন তা পরিকল্পিত দ্বন্দ্বের পূর্বস্তর রূপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।

বিচ্ছিন্ন অবস্থান (Isolation) ঃ

ইহা এমন এক সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অপরাপর ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সমস্ত প্রকার সংযোগ সামাজিক আদান-প্রদান, সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া থেকে বঞ্চিত হয়। ইহা প্রধানতঃ দু'প্রকারের হয়—(১) স্থান সংক্রান্ত (spatial) এবং (২) জৈবিক (Organic)। দুর্গম, বিপদশঙ্কুল প্রাকৃতিক অঞ্চলে বসাসকারী কোন গোষ্ঠী যখন অপরাপর গোষ্ঠীর সঙ্গে অবস্থানগত কারণে সামাজিক সংযোগে অক্ষম হয় বা বঞ্চিত হয়, তাকে স্থান সংক্রান্ত বিচ্ছিন্ন-অবস্থান বলা হয়। এটি মূলতঃ বাহ্যিক। দূরত্ব বা

দুর্গমতা বা অবস্থানগত প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠতে পারলে এ ধরণের বিয়োজক প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি সম্ভব।

কিন্তু জৈবিক প্রতিকূলতা অর্থাৎ অঙ্গগত প্রতিবন্ধিতা বা মানসিক প্রতিবন্ধিতার কারণে যখন এক বা একাধিক ব্যক্তি মূল সামাজিক প্রবাহের সঙ্গে সংযোগসাধনে বঞ্চিত হয়, তবে সেই ধরণের বিচ্ছিন্নতার প্রক্রিয়া সমজে নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘ সংযোগহীনতা মানসিক ব্যাধি সৃষ্টি করে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে কোন ব্যক্তিকে সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা একপ্রকার অপরাধ।

এছাড়াও বিভিন্ন কুসংস্কার বশতঃ (ধর্মীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক) কোন বিশেষ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে মূল সমাজ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার ঘটনা ও ঘটে। উদা ঃ অস্পৃশ্যতা।

সামাজিক সংযোগ হতে বঞ্চিত ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীবর্গ যেমন সমাজের মূল স্রোত থেকে পিছিয়ে পড়ে, তেমনি বৃহত্তর সমাজে এই ধরণের পশ্চাৎপদ বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর অবস্থান মূল সমাজের উন্নয়ন ও অগ্রগতির পরিপন্থী হয়ে ওঠে। এ ধরণের বিয়োজক প্রক্রিয়া সামাজিক সংহতিরও পরিপন্থী।

উপসংহার (Conclusion) ঃ

বর্তমান অধ্যায়টিতে সমাজতত্ত্বের মৌলিক ধারণগুলি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সমাজতত্ত্বে সাম্মানিক ব্যাচেলর ডিগ্রী কোর্সের ছাত্রছাত্রীদের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ধারণাগুলি সম্পর্কে আলোচনার পরিধি, বিস্তার ও সীমারেখা নির্মাণ করা হয়েছে। আরো বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য 'গ্রন্থপঞ্জী'-তে উল্লেখিত গ্রন্থসমূহের সাহায্য অবশ্যই নেওয়া যেতে পারে।

এ অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে, সমাজে নিয়ত ঘটে চলা বিবিধ সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া বিষয়ে যারা বিভিন্ন রূপে সম্মিলিত, ধাপে ধাপে ঘটিত ও পুনরাবৃত্ত হয়ে বিবিধ প্রকার সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক প্রক্রিয়ার নির্মাণ করে। সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগীতা ভিন্ন সমাজের অস্তিত্ব অসম্ভব। সুতরাং সমাজে বিবিধ প্রকার সংযোজক সামাজিক প্রক্রিয়া তো ক্রিয়াশীল থাকেই, তারই সঙ্গে ক্রিয়াশীল থাকে বিবিধ বিয়োজক প্রক্রিয়া যা সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ভিন্নতাকে ভিত্তি করে দূরত্ব সৃষ্টি করে। প্রতিযোগীতা, দ্বন্দ্ব প্রভৃতি বিয়োজক প্রক্রিয়া সমাজস্থ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আপেক্ষিক দূরত্ব সৃষ্টি করলেও সেগুলি আবার সমাজের জড়তা কাটানোর স্বার্থে, সমাজকে গতিশীল রাখতে এবং এগিয়ে নিয়ে যেতে সহায়ক হয়। তবে এইসব বিয়োজক প্রক্রিয়া যাতে নিয়ন্ত্রণহীন বা ব্যাপক না হয়ে পড়ে তার জন্যও সমাজে প্রতিনিয়ত ক্রিয়াশীল থাকে দু'ধরণের সংযোজক প্রক্রিয়া---উপযোজন এবং আত্তীকরণ।

এই সমস্ত সামাজিক প্রক্রিয়াগুলি নির্দিষ্ট নিয়মানুগ, বিধিবদ্ধ এবং নিয়ন্ত্রিত উপায়ে পরিচালিত হয় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলি হল সমাজস্থ জনগোষ্ঠীর বিবিধ স্বার্থপূরণের নিমিত্ত গড়ে ওঠা সংঘ বা সমিতির কর্মসম্পাদন ও উদ্দেশ্যপূরণের জন্য নির্মিত কর্মবিধি। বিবিধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পারস্পরিক সংযুক্তি এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার ভিত্তিতে কার্য সম্পাদন করে। ফলে

সামাজিক সংহতি বজায় থাকে এবং সমাজজীবনের অস্তিত্ব, ধারাবাহিকতা এবং সুষ্ঠতা বজায় রাখা সম্ভবপর হয়।

নমুনা প্রশ্নমালা (Model Questions) ঃ

১. সংক্ষিপ্ত উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ মান—৬

(ক) পার্থক্য নির্ণয় কর ঃ (প্রতিটি প্রশ্নের মান ঃ ৬)

(১) জনসম্প্রদায় এবং সমিতি, (২) সমিতি এবং প্রতিষ্ঠান, (৩) জনসম্প্রদায় এবং সমাজ, (৪) প্রতিযোগীতা এবং দ্বন্দ্ব, (৫) উপযোজন এবং আত্তীকরণ, (৬) সহযোগীতা এবং দ্বন্দ্ব, (৭) সংযোজক প্রক্রিয়া এবং বিয়োজক প্রক্রিয়া, (৮) রাষ্ট্র এবং সরকার, (৯) একগামী বিবাহ এবং বহুগামী বিবাহ, (১০) অন্তর্গোষ্ঠী এবং বহির্গোষ্ঠী।

(খ) সংক্ষিপ্ত টীকা লেখ ঃ (প্রতি প্রশ্নের মান ঃ ৬)

(১) রাজনৈতিক দল, (২) চাপ-সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী, (৩) জেমিনশ্যাফট ও জেসেলশ্যাফট, (৪) নির্দেশক গোষ্ঠী, (৫) বহুপত্নীক বিবাহ, (৬) সামাজিক প্রক্রিয়া রূপে প্রতিযোগীতার বৈশিষ্ট্য, (৭) দ্বন্দ্বের ইতিবাচক প্রভাব, (৮) একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সম্পত্তির বৈশিষ্ট্যাবলী, (৯) অন্তবিবাহ এবং বহির্বিবাহ, (১০) সমসংস্থ ও অসমসংস্থ বিবাহ।

২. বিশ্লেষণ-ধর্মী প্রশ্ন ঃ মান—১২

(ক) বিদ্যালয় একটি সমিতি নাকি প্রতিষ্ঠান, যুক্তিসহ আলোচনা করো।

(খ) জন-সম্প্রদায়ের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

(গ) সমাজে প্রতিষ্ঠানগুলির গুরুত্ব কি?

(ঘ) বিবাহের প্রকারভেদগুলি আলোচনা করো।

(ঙ) সমাজে শ্রমবিভাজন প্রয়োজন কেন?

(চ) রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য কি কি?

(ছ) সমাজে ধর্মের নেতিবাচক প্রভাবগুলি আলোচনা করো।

(জ) সমাজে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করো।

(ঝ) উপযোজনের মাধ্যমগুলি কি কি?

৩. রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ মান—২০

(ক) মিথষ্ক্রিয়া কি? সমাজে মিথষ্ক্রিয়ার গুরুত্ব আলোচনা করো।

(খ) সামাজিক প্রক্রিয়া কাকে বলে? সমাজ হল দ্বন্দ্বকে অতিক্রম করে সহযোগীতার পথে চলা—ব্যাখ্যা করো।

(গ) সামাজিক প্রক্রিয়া হিসাবে আত্তীকরণের গুরুত্ব আলোচনা করো।

(ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে সমাজে ধর্মের গুরুত্ব আলোচনা করো।

(ঙ) বিবাহ একটি বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠান। কেন?

(চ) অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে শ্রমবিভাদন এবং সম্পত্তির গুরুত্ব আলোচনা করো।

(ছ) সমাজে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

(জ) সমাজে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

(ঝ) একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠান রূপে 'শিক্ষা'-র বৈশিষ্ট্য এবং তাৎপর্য আলোচনা করো।

References and Further Readings (সহায়ক গ্রন্থাবলী এবং বিস্তারিত অধ্যয়নের জন্য নির্দেশিত গ্রন্থাবলী)

Albrow, M. (1970). *Bureaucracy.* London : Macmillan.

Archer, M.S. (1979). *Social Origina of Educational System.* London : Sage.

Barnes, H.E. (1946). *Social Institutions.* New York : Prentice-Hall.

Berger, P. (1966). *Invitation to Sociology.* USA: Pelican Press.

Berger, P. and Luckmann, T. (1966). *The Social Construction of Reality : An Essay in teh Sociology of Knowledge.* Garden City, New York : Doubleday.

Bogardus, E.S. (1940). *The Development of Social Thought.* London : Longmans, Green and Comany.

Bottomore, T.B. (1971). *Sociology-A guide to Problems and Literature.* USA : Pantheon Books.

Bottomore, T.B. and Insbet, R. (eds.). (1978). *A History of Sociological Analysis.* New York : Basic Books.

Brondy, H.S. *Building a Philosophy of Education.* New York : The Macmillan Co.

Cooley, C. H. (1909). *Social Organization : a Study of the Larger Mind.* New York : Charles Scribner's Sons.

Dohrenwed, B. P. (1959). Egoism, altruism, anomie, and fatalism : A conceptual analysis of Durkheim's types. *American Sociological Review, 24*(4), 466 – 473. Retrieved July 20, 2008 from EBSCO Online Database Academic Secrch Premier :

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=aph& AN=12596871& site=ehostlive

Dewey, J. (1916). *Democracy and Education.* New York: The Macmillan Co.

Durkheim, E. (1951). *Moral Education : A Study in the Theory and Application of the Sociology of Education.* New York : Free Press.

— 1926. *The Elementary Forms of Religious Life : A study in Religious Sociology.* London : Allen and Unwin.

— (1956). *Education and Sociology.* Glencoe, III : Free Press.

— (1893/1933). *The Division of Labour in Society.* New York : Macmillan.

Duverger, M. (1954). *Political Parties.* London : Methuen.

Eston, D. (1965). *A Systems Analysis of Political Life.* New York : Wiley.

Ellwood, C. A. (1925). *The Psychology fo Human Society.* Chs. VI, X, XIII. Ne York : D. Appleton and company.

Etzioni, A. (1964). *Modern Organizations.* USA : Prentice-Hall.

Giddens, A. (2001). *Sociology* (4th Edn). Cambridge, UK : Blackwell Publishers.

Giddings, F. H. (1920), *Principles of Sociology.* New York : The Macmillan Co.

Gillin, J.L. and Gillin, J.P. (1942). *An Introduction to Sociology.* New York : Macmillan.

Ginsberg, M. (1979). *Sociology.* New Delhi : Surjeet Publication.

Gisbert, P. (1983). *Fundamentals of Sociology.* Bombay : Orient Longmans.

Goode, W.J. (1964). *The Family.* Englewood Cliffs : Prentice Hall.

Goodfellow, D.M. (1939). *Principles of Economic Sociology.* London : George, Routledge and Son.

Goodsell, W. (1934). *A History of Marriag and the Family.* Rev. Edit. New York : Macmillan.

Green, A. W. (1964). *Sociology–Analysis of Life in Modern Society* (4th Edn.), US: McGraw-Hill Inc.

Haralambos, M. (1997). *Sociology – Themes and Perspectives,* Delhi : Oxford University Press.

Hobel, A. (1972). *Anthropology.* New York : Random House.

Horton, P.B. and Hunt, C.L. (1964). *Sociology.* New York : McGraw-Hill.

Johnson, H.M. (1960). *Sociology: A systematic Introduction.* New York: Harcourt, Brace & World.

Key, V.O. (1964). *Plitics, Parties and Pressure Groups,* 5th ed. New York : Crowell.

Koenig, S. (1960). *Sociology–An Introduction to the Science of Society,* New York :. Barnes and Nobel, INC.

Koenig, S. (1961). *Sociology: Man and Society.* New York : Barnes and Nobel

Link, S. (2009). *Social Category & Social Aggregate.* EBSCO Research Starters. EBSCO Publishing Inc. retrieved from

http://www.dswleads.com/Ebsco/Social%20Category%20&%20Social% 20Aggregate.pdf

Lowe, A. (1935). *Economics and Sociology.* London ; Allen and Unwin.

Lundberg, G.A. (1939). *Foundation of Sociology.* New York: Macmillan.

Majumder, D,N. and Madan, T.N. (1956). *An Introduction to Social Anthropology.* Bombay : Asia Publishing House.

Mitchell, D. (1968). *A Dictionary of Sociology.* USA: Aldine Pub. Co.

Mulgund, I. C. (2008). *Readings in General Sociology.* Shrusti Prakashan Dharwad.

Newman, D. M. (2013). *Sociology : Exploring the Architecture of Everyday Life.* USA : Sage

Nisbet, R. (1970). *The Social Bond : An Introduction to the Study of Society.* New York : Knopf.

Ogburn, W.F. and M.F. Nimkoff. (1955). *Technology and the Changing FAmily.* Houghton Miffling : Boston.

Ogburn, W.F. and Nimkoff, M.F. (1964). *A Handbook of Sociology.* Ram Nagar, NewDelhi : Eurasia Publishing House (pvt). Ltd.

Park, R.E., Burgess, E. and McKenzi, R. (1925). *The City.* University of Chicago Press.

Shankar Rao, C. N. (2004). *Sociology : Primary Principles.* New Delhi : S. Chand & Co.

Sharma, R. N. (1976). *Principles of Sociollgy.* Media Publishers and Promotes limited, Bombay.

Sullivan, T.J. (2004). *Sociology–Concepts and Applications in a Diverse World* (6th End), USA : Pearson.

Sherif, M. (1948). *An Outline of Psychology.* New York : Harper.

Tonnies, F. (1887). *Gemeinschaft und Gesellschaft,* Leipzig : Fues's Verlag, 2nd ed. 1912, 8th edition, Leipzig : Buske, 1935 (reprint 2005, Darmastadt : Wissenschaftliche Buchgesellschaft); his basic and never essentially changed study of social man; translated in 1957 as "*Community and Society*",

Sumner, W. G. ([1906] 1959). *Folkways : A Study of the Sociological Importance of Usages, Manners, Customs, Mores, and Morals.* New York : Dover. → A paperback edition was published in 1960 by New American Library.

বাংলা ভাষায় রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

গিডেনস, এ. (ভাষান্তর : ঘোষ, হিমাংশু), (২০০১)। **সমাজতত্ত্ব।**

প্রধান, অ. (২০১০)। **সূচনা-সংকেতে সমাজতত্ত্ব।** কলকাতা ঃ রাজকৃষ্ণ পুস্তকালয়

মহাপাত্র, অ. (১৯৯৬)। **বিষয় সমাজতত্ত্ব।** কলকাতা ঃ ইণ্ডিয়ান বুক কনসার্ন